রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা

অধ্যাপক

শ্রী মাখন লাল রায় চৌধুরী

ডি, লিট, শাস্ত্রী

রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী

এম. এ., এল. এল. বি., ডি. লিট, শাস্ত্রী

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, মোয়াট গোল্ড মেডেলিষ্ট, গ্রিফিথ স্কলার, স্যার আশুতোষ গোল্ড মেডেলিষ্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐস্লামিক ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

॥ শ্রীগুরু লাইব্রেরী ॥

॥ কলিকাতা - ৬ ॥

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীব্রজেন্দ্র চৌধুরী

মুদ্রাকর :
শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ
অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

মূল্য : চারি টাকা

উৎসর্গ পত্র
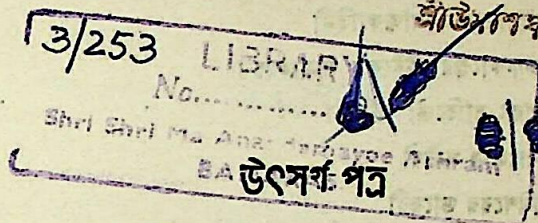
ঋষিকল্প অধ্যাপক

শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী

মহাশয়

শ্রীচরণেষু

শ্রদ্ধাবনত

প্রাক্তন ছাত্র

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

গ্রন্থাকারের অন্যান্য গ্রন্থ

বাংলা—জাহানারার আত্মকাহিনী
কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা
শরৎ সাহিত্যে পতিতা
বাংলার মনীষী
মিশরের ডায়েরী
হে অতীত কথা কও
বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী
আরব শিশুর কাহিনী
ভারতবর্ষ পরিচয়
ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় (তিন খণ্ড)
আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস—১৭৬৩-১৯৪৯

ইংরাজি—Din-i-Ilahi (আকবরের ধর্মনীতি)
State and Religion in Mughal India
Music in Islam.
Influence of Sanskrit on Arabic literature.

হিন্দী—ভারতবর্ষকা ইতিহাস
ভারতীয় রাষ্ট্র পরিচয়

আরবী—আল গীতা (আরবী ভাষায় গীতার
ভূমিকা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)
ইত্যাদি।

সূচীপত্র

রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা

ভূমিকা

শৈশবে মাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইয়াছি। অনেক অলৌকিক কাহিনী পড়িয়াছি, শুনিয়াছি, আলোচনা করিয়াছি। আজ যাহা অবিশ্বাস্য মনে হয়, শৈশবে তাহা অবিশ্বাস করি নাই; যথা—মানুষ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির শৃঙ্গ ছিল। দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া মন্ত্রপূত ভোগ স্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন—দশরথ দেবতার বরে চারি পুত্র লাভ করিলেন। রাজর্ষি জনক হলচালনা করিবার সময় কর্ষিত ক্ষেত্র হইতে সীতাকে লাভ করিলেন। হরধনু ভঙ্গ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে লাভ করিলেন। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে নন্দিনী কামধেনুর জন্য বিবাদ হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। রাবণের দশমুণ্ড ছিল। মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করিলেন! রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে সীতাকে হরণ করিলেন। পক্ষিরাজ জটায়ুর সঙ্গে আকাশ-পথে রাবণের যুদ্ধ হইল। হনুমান লাঙ্গুলের আগুনে লঙ্কা দগ্ধ করিলেন। রামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। কুম্ভকর্ণ বৎসরে ছয়মাস নিদ্রা সুখ উপভোগ করিতেন। মেঘনাদ দেবতার বরে মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিতেন। হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রামায়ণে অলৌকিক কাহিনী

ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মতন এই অলৌকিক কাহিনীগুলি আমাকে অপূর্ব্ব আনন্দ দিত। কি প্রশ্নবিহীন বিশ্বাস লইয়াই

না সে সব কাহিনী পাঠ করিয়াছি; মুগ্ধ হইয়াছি! আজ কিন্তু রামায়ণ পাঠ করিয়া সেই দ্বিধাহীন আনন্দ পাই না। সেই আনন্দের উৎসমুখ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ আসিয়াছে মনে বৈজ্ঞানিকের প্রশ্ন—আজ বিচার করি রামায়ণের ঐতিহাসিকতা, বাল্মীকির কাব্যরস, রামায়ণের প্রক্ষিপ্তাংশ, রামায়ণে কল্পনার স্থান, মহাভারতই অগ্রজ—না রামায়ণ? রামায়ণে বর্ণিত মানবাতিরিক্ত জীব দেবতা, রাক্ষস, বানর, যক্ষ, নাগ, অপ্সরা, কিন্নর, পিশাচ সত্যই ছিল কি না এবং থাকিলেও কি রূপে ছিল? বৈজ্ঞানিক ছুরিকাদ্বারা পুষ্পের অঙ্গচ্ছেদন করিয়া বিশ্লেষণ করেন—কিন্তু তিনি আর নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না।

রামায়ণে মানবাতিরিক্ত বহু জাতির সন্ধান পাই—দেবতা, দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষ, অপ্সরা, বিদ্যাধর, পিশাচ, বানর, নাগ, কিন্নর, কিম্পুরুষ। এই সকল জাতির মধ্যে রামায়ণে মানুষ, রাক্ষস ও বানরই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। দেবতাগণ রামায়ণ বর্ণিত ঘটনাবলীর সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নাই। দেবতার স্থান রামায়ণে পরোক্ষ—বহু অলৌকিক কাহিনীর প্রচ্ছদপটে দেবতার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

রামায়ণে দেবতার স্থান

রামায়ণে দেবতারা নেপথ্যে উপস্থিত ছিলেন। পুরাণ বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে দেবতাগণ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও সজীব ভাবে জড়িত। মানব, রাক্ষস, বানর একই পিতার ঔরসজাত সন্তান। অনেক সময় একই দেবতার সন্তান মাতৃভেদে বিভিন্নজাতি ও পরিচয় লাভ করিয়াছে। দেবতাগণ রাক্ষসী, বানরী ও মানবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন। একই পিতার সন্তান বিভিন্ন জাতীয়া কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে। বিশ্রবা মুনির পুত্র রাবণ ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করিয়াছেন, কুম্ভকর্ণ বৈরোচনবলি দৈত্যের দৌহিত্রী বজ্রজ্বালকে বিবাহ করিয়াছেন, বিভীষণ গন্ধর্ববরাজ শৈলুষের কন্যা সরমাকে বিবাহ করিয়াছেন। ময়দানব অপ্সরা কন্যা হেমাকে

এবং সুকেশ গ্রামণী যক্ষ কন্যা সন্ধ্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। এই সকল জাতকের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ বিচার করিলে তাহাদের সম-পিতৃত্ব অনুমান করা যায়।*

দেবতার ঔরসে এবং ভিন্ন জাতীয়া মাতার গর্ভে জাত সন্তানদের বিপদের সময় দেবতারা সাহায্য কারয়াছেন ; যথা—পবন নন্দন হনুমানকে পবনদেব নানাপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। দেবতা, মানুষ, রাক্ষস ও বানর প্রভৃতি জাতির মধ্যে সন্তানপ্রীতি, সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা অতি সহজভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, পশুপক্ষীর মধ্যেও দেবতাত্মার সংযোগ আছে। সৃষ্টির সকল অংশ যেন কোন না কোন দেবতার অভিব্যক্তি ; দেবতারা তাহাদের সন্তান ও অনুগৃহীতদের মধ্যে জাতি বিচার করেন নাই। যিনি দেবতাকে আরাধনা করিয়াছেন, অথবা দেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন—দেবতা তাঁহাকে বর দান করিয়াছেন, অস্ত্রদান করিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। দেবতারা জাতিভেদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। দেবতা, দানব, যক্ষ, রক্ষ, মানুষ প্রভৃতি সকল জীবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের স্তব করিয়াছেন, আরাধনা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই উপাস্যদেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন নির্বিচারে।

দেবতার সন্তান

অনেকেরই ধারণা রামায়ণের একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। কারণ, রামায়ণ বর্ণিত স্থানগুলি ঐতিহাসিক, যথা—অযোধ্যা, মিথিলা, কিষ্কিন্ধ্যা প্রভৃতি নগরী—দণ্ডকারণ্য, বিন্ধ্যারণ্য প্রভৃতি বনাঞ্চল—সরযূ, গঙ্গা, নর্ম্মদা, গোদাবরী প্রভৃতি নদী—হিমালয়, মহেন্দ্র, মেরু প্রভৃতি পর্ব্বত। ভারতের বহু তীর্থস্থানের সঙ্গে রামায়ণ বর্ণিত ঘটনার যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন। ন্যূনাধিক পরিমাণে অনেকগুলি স্থানীয় কিংবদন্তীর সঙ্গে রামায়ণের ঘটনার সংযোগ রহিয়াছে। সুতরাং রামায়ণ বর্ণিত ঘটনাগুলিকে বিনাবিচারে অবিশ্বাস্য

* যথা বিশ্রবা মুনির পুত্র যক্ষরাজ কুবের এবং রক্ষরাজ রাবণ।

বলা যায় না। অথচ রামায়ণে বহু অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত আছে। বাল্মীকি ত নির্ব্বোধ ছিলেন না। তিনি কেন এই সমস্ত আপাত দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য কাহিনীর সমাবেশ করিয়াছেন? বোধ হয়, এই কাহিনীগুলি ইচ্ছাকৃত রচনা; কারণ, সমস্ত স্তরের লোকের জন্য রামায়ণ পরিকল্পিত। সরল বিশ্বাসী এবং জ্ঞানী, পুরুষ এবং নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ সকলের উপযোগী ও উপভোগ্য সামগ্রী রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণের আভ্যন্তরীণ তথ্য ও আদর্শ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, গুরু-শিষ্য প্রভৃতি সকলেরই গ্রহণীয়। রামায়ণে জ্ঞান অথবা ভক্তি অপেক্ষা কর্ম্মেরই প্রাধান্য।

রামায়ণের সমালোচনা

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে রামায়ণকে সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তীকালে মনীষিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়া রামায়ণকে আলোচনা করিয়াছেন।

যোগবাশিষ্ঠ

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ মূল রামায়ণ হইতেও কলেবরে বৃহত্তর। রামচন্দ্র এবং আচার্য্য বশিষ্ঠের সহিত আলোচনার মাধ্যমে এই গ্রন্থখানি পরিকল্পিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র প্রশ্নকর্ত্তা, আচার্য্য বশিষ্ঠ উত্তরদাতা; বক্তব্য বিষয় ভারতীয় দর্শনগ্রন্থ। গ্রন্থখানি ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ঋষি বাল্মীকি প্রণীত মূল রামায়ণের ব্যাখ্যা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিবৃত হইয়াছে।

অদ্ভুত রামায়ণ

অদ্ভুত রামায়ণে কবি বাল্মীকি ঋষি ভরদ্বাজের নিকট রামচন্দ্রের অলৌকিক কীর্ত্তি কলাপ বিবৃত করিয়াছেন। অদ্ভুত রামায়ণে দুই জন রাবণের কাহিনী উল্লিখিত—একজন রাবণ সহস্র মুণ্ড, দ্বিতীয় রাবণ দশমুণ্ড। সীতা সহস্র মুণ্ড রাবণকে নিধন করেন। এই অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী সত্যই অদ্ভুত।

আধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অন্যদিকে বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র মানুষ মাত্র; অবশ্য

তিনি অতিমানুষ। বাস্তবিক পক্ষে অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের খণ্ডাংশ মাত্র; অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র নিজকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মাতা কৌশল্যা পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে পরমেশ্বর জ্ঞানে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন।

অধ্যাত্ম রামায়ণ

ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত **দশাবতার চরিতম্** গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের পূর্ণ অবতার রূপে পরিকল্পিত।

দশাবতার চরিতম্

কবি কালিদাস **রঘুবংশ** কাব্যে পাঁচটি মাত্র সর্গে বাল্মীকির রামায়ণের মানবীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কালিদাস হনুমানের লাঙ্গুল উল্লেখ করেন নাই; তিনি রাবণের দশমুণ্ড সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য পাঠ করিলে মনে হয় যেন কালিদাস বাল্মীকির সঙ্গে প্রতিভার প্রতি-যোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভট্টিকাব্যের রচয়িতা ভর্ত্তৃহরি (?) দ্বাদশ সর্গে সেতুবন্ধনের পরে লঙ্কার রাজসভায় পুলস্ত্য, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত প্রভৃতি বীর পুরুষগণের আলোচনার মধ্য দিয়া নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া রামায়ণের কাহিনীকে নবরূপ দান করিয়াছেন। মহাবীর হনুমানের পূজার উল্লেখ কালিদাসে বা ভট্টিতে নাই। অথচ তুলসীদাস **রামচরিতমানসে** রামচন্দ্রকে স্বয়ং ভগবান রূপে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে ভক্তির সঙ্গে কর্ম্মের, ইহলোকের সঙ্গে অধ্যাত্মলোকের সামঞ্জস্য করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। ভারতের বাহিরে যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে রামায়ণ পুরাণের অংশ রূপে গৃহীত হইয়াছে। দ্বীপময় ভারতের মন্দির গাত্রে রামায়ণ বর্ণিত কাহিনীগুলি অত্যন্ত জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে।

কালিদাস, ভর্ত্তৃহরি

তুলসীদাস, কৃত্তিবাস

ভবভূতির অনুকরণে বিদ্যাসাগর মহাশয় **সীতার বনবাসের** মধ্যে এক অপূর্ব্ব করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। পাঠক এখানে অতি সহজেই রামায়ণের নায়িকা সীতার প্রতি সহজ সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া যান।

বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণকে রাজোচিত গুণাবলীর মূর্ত্ত প্রতীকরূপে পরিকল্পনা করিয়া বাল্মীকির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। আর্য্য রামের তুলনায় রাক্ষস রাবণ, অযোধ্যার রাজকুমার লক্ষ্মণের তুলনায় লঙ্কার রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ যেন অধিকতর উজ্জ্বল।

মাইকেল

দীনেশ সেন ও রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ আধুনিক যুক্তিবাদী মনের রুচিবোধকে তৃপ্ত করে। পাশ্চাত্য সমালোচক রামায়ণকে প্রচ্ছন্ন ইতিহাস বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের রামায়ণের উপর দ্বাবিংশতি বক্তৃতার মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ

রাক্ষস পরিচয়ঃ—

প্রশ্ন হইল রাক্ষস কাহারা? রাক্ষস শব্দের ধাতুগত অর্থ কি? লৌকিক অর্থ কি?

সাধারণ লোকের ধারণা--রাক্ষস মানবেতর, রাক্ষস অনার্য্য জাতি। আমরা প্রথমে অগস্ত্য বর্ণিত রাক্ষসের জন্মকাহিনীর মাধ্যমে রাক্ষস শব্দের ধাতুগত অর্থ আলোচনা করিব, তারপর রাক্ষস সম্বন্ধে লৌকিক ধারণার বিবরণ দিব। সর্ব্বশেষে রাক্ষসের অনার্য্যত্ব বিচার করিব।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্থ সর্গে রাক্ষসের জন্মকাহিনী অগস্ত্য মুনি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। পুরাকালে প্রজাপতি মানব প্রভৃতি সৃষ্ট প্রাণিপুঞ্জের রক্ষার জন্য কতকগুলি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রাণীগণ ক্ষুৎ পিপাসায় পীড়িত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল—"আমরা কি করিব?" ব্রহ্মা সহাস্যে তাহাদিগকে কহিলেন—"হে জীবগণ, তোমরা যত্নসহকারে মানবগণকে রক্ষা কর।" তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অক্ষুধার্ত্ত জীব "রক্ষামঃ" অর্থাৎ

রাক্ষসের জন্ম কাহিনী

'রক্ষা করিব' এই কথা বলিল। অন্য কতকগুলি ক্ষুধার্ত্ত জীব বলিল, "যক্ষামঃ" অর্থাৎ 'ভক্ষণ করিব।' ব্রহ্মা বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষামঃ' বলিয়াছ, তাহারা রাক্ষস নামে পরিচিত হইবে, আর যাহারা 'যক্ষামঃ' বলিয়াছ, তাহারা যক্ষ নামে পরিচিত হইবে।"*

এই নামকরণ হইতে রাক্ষস ও যক্ষ জাতির চরিত্রের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। রক্ষ বা যক্ষ কেহই জাতিগতভাবে সৎ বা অসৎ ছিল না। ব্যক্তির গুণাগুণ হইতে নূন্যাধিক পরিমাণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। যক্ষ কুবের তপস্যা দ্বারা দেবগণের পর্য্যায়ে উন্নীত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া কুবেরকে যজ্ঞভাক্ এবং চতুর্থ লোকপাল পদে নিযুক্ত করিলেন। রাক্ষসের জন্মকাহিনী বিষ্ণুপুরাণে অন্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

রাক্ষসের রূপ

লৌকিক ধারণানুসারে রাক্ষস বলিতে প্রথমেই মনে আসে তাড়কা রাক্ষসী—বিরাটদেহা, বিকৃতবদনা, আকাশগামিনী, নরমাংস লোভাতুরা। পরবর্ত্তী দৃশ্য—বিশাল দেহ বিরাধ রাক্ষস—হস্তিমুণ্ড ত্রিশূলে বিলম্বিত করিয়া পথ চলিতেছে। মস্তক বিহীন কবন্ধ যোজনব্যাপী হস্তপ্রসারিত করিয়া পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, মনুষ্য ভোজন করিতেছে। দশমুণ্ড, বিংশতি-হস্ত, মেঘনীল বর্ণ, অতিকায় রাবণ পঞ্চবটী হইতে সীতাকে হরণ করিতেছেন। কুম্ভকর্ণের যোজনব্যাপী দেহ, লঙ্কা নগরীতে ছয়মাস নিদ্রাভিভূত—সহস্র কলস শোণিত তাঁহার পিপাসার তৃপ্তি। সর্ব্বশেষে অশোক বনে সীতাকে বেষ্টন করিয়া বিকটাকৃতি চেড়িগণ ভয় প্রদর্শন করিতেছে। সেই রাক্ষস গোষ্ঠীর মধ্যে কেহ একচক্ষু, কেহ একস্তনা, কেহ পিঙ্গলকেশা, কেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, কেহ শংকুকর্ণা, কেহ বৃহৎনখা, কেহ কর্কশভাষিণী। রাক্ষস সম্বন্ধে এইতো লৌকিক ধারণা,—রাক্ষস মায়াবলধারী, ইচ্ছারূপী।

* যক্ষ্ ধাতুর অর্থ পালন করাও হয়।

কিন্তু ব্যবহারিক ভাষায় রাক্ষস শব্দ বিশেষ্য না বিশেষণ? রাক্ষস একটি ভাব—না একপ্রকার জীবনধারা? অথবা একপ্রকার কর্ম্মপ্রচেষ্টা? রাক্ষস আচার, না রাক্ষস কর্ম্ম? রাক্ষস জাতি—মানবেতর না মানবীয়? রাক্ষস কি অনার্য্য? অনার্য্য শব্দ রামায়ণে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? গভীরভাবে পাঠ করিলে সাধারণতঃ এই প্রশ্নগুলিই পাঠকের মনে জাগ্রত হয়।

রাক্ষস শব্দের অর্থ

রাক্ষস শব্দ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, হরিবংশ, পুরাণাদি-গ্রন্থে নানাস্থানে এবং নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে উল্লেখ আছে—পিতার জরা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্য কন্যা দেবযানীর পুত্র যদুকে বলিয়াছিলেন "তুমি আমার ঔরসে ক্ষত্ররূপী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ........তুমি রাজ্যচ্যুত। তোমার সন্তানগণ রাক্ষস হইবে।"

রাক্ষস—আর্য্য?

যদু রাজ্যচ্যুত হইয়া ক্রৌঞ্চবনে গমন করিলেন, এবং তথায় দীর্ঘকাল বসবাস আরম্ভ করেন। সেই যযাতি নন্দন যদু সহস্র সহস্র যাতুধান রাক্ষসের জন্ম দিলেন।

> দেবযানী সুতং ক্রুদ্ধো রাজা (যযাতি) বাক্যমুবাচহ।
> রাক্ষসস্ত্বং ময়া জাতঃ ক্ষত্ররূপো দুরাসদঃ॥ ৭।৬৯।১, ১৪
> রাক্ষসান্ যাতুধানাংস্ত্বং জনয়িষ্যসি দারুণান্।
> নতু সোমকুলোৎপন্নে বংশে স্থাস্যসি দুর্ম্মতে॥ ৭।৬৯।১৫-১৬
> যদুস্তু জনয়ামাস যাতুধানান্ সহস্রশঃ।
> পুরে ক্রৌঞ্চবনে দুর্গে রাজবংশবহিষ্কৃতঃ॥ ৭।৬৯।২০

যযাতি চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র যদু শাপগ্রস্ত হইলেন; অর্থাৎ রাক্ষস স্বভাব হইলেন। যদুর বংশধরগণ যাতুধান রাক্ষস নামে পরিচিত।

সুতরাং দেখা যায় মানুষও রাক্ষসের জন্মদান করিতেন। এখানে রাক্ষস অর্থে একপ্রকার অবাঞ্ছিত স্বভাব বুঝাইয়াছে।

মহাভারতে রাক্ষস শব্দ নানাস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে বলিয়াছেন, "আমি তোমাকে রাক্ষস মনে করি, কারণ তুমি মোহ প্রযুক্ত প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছ না—তোমার মন তমসাবৃত মনে করিতেছি।

মাং পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধমিতি তত্ত্বং মোহান্ন বুধ্যসে।
মন্যে ত্বাং রাক্ষসং ক্রূরং তথা চাসি তমোবৃতঃ।

মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব্ব ৬৬ অধ্যায়—৩১ শ্লোক

এখানে রাক্ষস শব্দ মোহগ্রস্ত মানুষের প্রতি প্রযোজ্য।

অনুশাসন পর্ব্বে উল্লিখিত আছে যে এই পৃথিবীতে অনেক শ্রদ্ধাবান বিশ্বাসী মানব আছে এবং মানুষের মধ্যে অনেক রাক্ষস আছে।

সন্তি লোকে শ্রদ্ধধনা মনুষ্যাঃ সন্তি শূদ্রা রাক্ষসমানুষেষু। ২৩-৭৬ অনু

এখানে রাক্ষস অর্থে ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন মানব।

শল্য পর্ব্বে উল্লিখিত আছে যে ইহলোকে যাহারা ব্রাহ্মণকে বিদ্বেষ করে, তাহারাই রাক্ষস হইয়া থাকে।

যে ব্রাহ্মণান্ প্রদ্বিষন্তি তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ।
আচার্য্যমৃত্বিঙ্ঞ্চৈব গুরুং বৃদ্ধজনং তথা॥
প্রাণিনো যেঽবমন্যন্তে তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ। ২১।২২-৪৩ অঃ শল্য।

এখানে রাক্ষস একটি মানসিক ভাব ও ব্যবহারিক আচরণ।

শান্তি পর্ব্বে পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত ও বিবিধ ম্লেচ্ছ জাতি এক সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে।

পিশাচা রাক্ষসাঃ প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
প্রণষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচার চেষ্টিতাঃ॥ ১৬।৮৮ শান্তি

মহাভারতে রাক্ষস শব্দ ম্লেচ্ছ আচারহীন, জ্ঞানহীন, ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বন পর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি সংগ্রামে যক্ষ, রক্ষ, দানব ও বিপরীতাচারী রাজাদিগকে ভস্মকর চক্রে নষ্ট করিলাম।"

৩০-২৮ বন।

অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনকালে দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের আস্যদেশ (মুখ) হইতে অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব নির্গত হইল। ৫।৬।৮-১৩১

যদা যদা চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি সত্তম।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্।
দৈত্যা হিংসানুরক্তাশ্চ অবধ্যাঃ সুরসত্তমৈঃ।
রাক্ষসাশ্চাপি লোকেঽস্মিন্ যদোৎপৎস্যন্তি দারুণাঃ॥

২৭।২৮।২৯-১৮৯ বনপর্ব্ব।

মহাভারতে আছে, সাত্ত্বিকগণ দেবপূজা করেন, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি যক্ষ রাক্ষসের পূজা করেন, তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ভূত প্রেতের পূজা করেন।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাক্ষসাঃ
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।। ৪।১।৪ ভীষ্ম

পরাশর ঋষি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ রাক্ষস যজ্ঞ করেন। আদি ১৮১।২। রাক্ষসগণও পূজার অধিকারী ছিল। যক্ষ ও রাক্ষসের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলিতে মাংসাদি দ্রব্য প্রশস্ত। অনু ৯৮।৬০-৪২।

রাক্ষসেরা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিত।

তং গন্ধর্ব্বানামপ্সরসাঞ্চ নিত্যমুপতিষ্ঠন্তে বিবুধানাং শতানি।
তং রাক্ষসাশ্চ পরিসংবদন্তি রায়স্পোষঃ স বিজীগিষুরেকঃ।

১৫—১৫৮ অনু

মহাভারতে বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত আছে যে রাক্ষসেরা ধর্ম্মজ্ঞ (৩১—১৫৮ আদি)। রাক্ষসেরা স্বর্গে গমন করে (২৯-৪৩ শল্য)।

মহাভারতে রাক্ষস

রাক্ষসেরা মন্ত্রণাকুশল ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ (৩-৫-১৭১ শান্তি) রাক্ষসেরও পুরোহিত ছিল (১৬-১৭২ শান্তি)। রাক্ষসেরা ধর্ম্ম সমবেক্ষণ করে (১২-১৫৭ বন) এমন কি মহাভারতকার বলিয়াছেন যে রাক্ষসেরা ধর্ম্মের মূল স্বরূপ (১৪-১৫৭ বন)।

চার্ব্বাক মুনিকে ব্রহ্মরাক্ষস আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (৩০-৯০ শান্তি)। মহাভারতে কয়েকপ্রকার রাক্ষসের উল্লেখ আছে, যথা—

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

রৌদ্র রাক্ষস, ভৌম রাক্ষস, (৮।৯০ আদি)। ইন্দ্র স্বয়ং বিরূপাক্ষ রাক্ষসদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছেন (১৩-১৭৩ শান্তি)। কুবেরের আদেশে রাক্ষসগণ দ্বিজগণকে রক্ষা করিয়াছেন (১৬-১৬২ বন)। বিশ্বামিত্রের অনুচরদের মধ্যে কিঙ্কর নামক রাবণের একজন অনুচর রাক্ষসও ছিল। কিঙ্কর বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ভক্ষণ করিয়াছিল। হিড়িম্বা রাক্ষসী পুত্র ঘটোৎকচ যজ্ঞ-ব্রাহ্মণ-দ্বেষ্টা, ধর্ম্মবিলোপ্তা ছিল। (২৬-১৭৯ দ্রোণ পর্ব্ব)

অন্যদিকে মহাভারতে রাক্ষসদের সম্বন্ধে তীব্র কটূক্তি আছে। যথা—বক রাক্ষস, হিড়িম্বা প্রভৃতি।

গীতায় **রাক্ষস** শব্দটি কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২।৯ অঃ গীতা

এখানে রাক্ষসী তামসী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শন প্রসঙ্গে ত্রিবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩।১০ অঃ গীতা

এখানে রক্ষ যক্ষ শব্দ দুইটি আদিমতম প্রকৃতির প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অর্জ্জুন গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—
স্থানে হৃষিকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬।১১ অঃ গীতা

এখানে **রাক্ষস** শব্দ অজ্ঞান শক্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পুরাণে রাক্ষসদের জন্ম, জাতি, শ্রেণী ও রূপ বর্ণিত রহিয়াছে।

ভাগবত পুরাণ অনুসারে কশ্যপের অন্যতম পত্নী সুরসার গর্ভে

পুরাণে রাক্ষস

রাক্ষসগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভাগ—স্কন্দ—৬। বায়ু পুরাণ অনুসারে **রাক্ষস** ত্বিষিমন্ত দেবগণের জ্ঞাতি ছিলেন। বায়ু-৩১।

বায়ু পুরাণে রাক্ষসের গোত্র ও গণের উল্লেখ আছে। রাক্ষসগণ মালা, মুকুট ও উষ্ণীষ ধারণ করিত। দুই প্রকারের রাক্ষস ছিল। তাহারা কেহ অন্নভোজী, কেহ মাংসাশী। বায়ু—৬৯।

অগ্নি পুরাণ অনুসারে রাক্ষসী নামে একজন মাতৃকা ছিলেন। অন্যদিকে রাক্ষসী চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর মধ্যে অন্যতমা। অগ্নি—৫২। রাক্ষসের রূপ ও প্রকৃতি বিভিন্ন পুরাণে বিক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বেদ—রাক্ষস, অসুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ অসুর শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেদে দেবরাজ ইন্দ্রকে অসুরপতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ঋক বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৪ সুক্তের ১ম মন্ত্রে ইন্দ্রকে অগস্ত্য ঋষি বলিতেছেন—নৃণ্ পাহি অসুর অস্মান্। হে ইন্দ্র, আপনি অসুর, আমাদিগকে পালন করুন। আর্য্য ঋষিগণ নিজেকে মনুষ্য (নৃ) আখ্যা দিতেন, স্বেতর (অপর জাতি) জাতিকে রাক্ষস, যাতুধান দস্যু আখ্যা দিতেন।

বেদে রাক্ষস অসুর

বেদের ৬ মণ্ডলে ২০ সুক্তের ২য় মন্ত্রে ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রকে বৃত্র বধের জন্য অসূর্য্য (অসুর) আখ্যা দিয়াছেন

বৃহৎ অসূর্য্যমস্ত মহৎ অসুরঃ ইন্দ্রইব।

মিত্র বরুণকেও অসুর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (৬৬ সুক্ত ২য় মন্ত্র)। অসু অর্থে প্রাণ;—অসুর অর্থ প্রাণদাতা অসূং রাতি পালয়তি। দেবাসুর একসঙ্গে সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন ১/২৫—২৬। তাহারা সহ এবং সমকর্ম্মী।

অথচ লৌকিক ভাষায় অসুর অর্থ ন+সুর=অ-দেবতা।

অসুরগণ কশ্যপের বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। এই সমস্ত স্ত্রীর অধিকাংশ দক্ষসূতা। কখনও কখনও দানব, অসুর, এবং রাক্ষস একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অসুরগণ প্রথমে দেবতার সঙ্গে এক যোগে একই উদ্দেশ্যে কাজ করিয়াছে—যথা অমৃতের জন্য সমুদ্র

মন্থন। পরে দেবতাগণ অমৃত হইতে অসুরদিগকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করিলে রাক্ষসগণ অনুচরদের সঙ্গে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন, ১/২৫—৪১। দানবগণের মধ্যে অনেকেই সৎ প্রকৃতি ছিলেন, যথা—মধুকৈটভ কখনও মিথ্যা বলেন নাই। দৈত্য-দানবদের মধ্যে সুন্দরী নারী ছিল, যথা—সুমতি, সুমনা, মন্দোদরী। ময়দানব সুনিপুণ শিল্পী ছিলেন, যেমন দেবতাদের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা। প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বলি নারায়ণকে ত্রিপাদভূমি অর্থাৎ ত্রিভুবন দান করেন। তিনি ছিলেন পরমদাতা।

অনেকের মতে রাক্ষস একটা জাতি--উহারা অনার্য্য। রামায়ণে অনার্য্য শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; রাক্ষস ও মানুষের সম্বন্ধে সমভাবেই অনার্য্য শব্দটি ব্যবহৃত। ঋক্‌বেদের ১, ৩, ৪, ৬ প্রভৃতি মণ্ডলে আর্য্য জাতির উল্লেখ আছে—আর্য্যগণ যজ্ঞানুষ্ঠানে

রাক্ষস কি জাতি?

ব্রতী হইয়াছেন, আর্য্যগণ ইন্দ্রাদি দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, আর্য্যগণ আর্য্যেতর জাতির ধ্বংস সাধনে তৎপর হইয়াছেন। বেদে আর্য্য শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? আর্য্যশব্দের ধাতুগত অর্থ—ঋ ধাতু ণ্যৎ—ঋ ধাতু অর্থে গতি বুঝায়। ঋ ধাতু আশ্রিত আর্য্য অর্থে বুঝায় গতিশীল —যাহারা সম্মুখে গমন করে বা অগ্রসর হইয়া চলে। প্রাচীন মানুষ যাযাবর ছিল। তাহারা খাদ্যের অন্বেষণে দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইত। তাহারা খাদ্যের জন্য ভূমি কর্ষণ করিত। চাষের উপযুক্ত ভূমির সন্ধান লাভ করিলে তাহারা ভূমিকর্ষণ করিয়া সেখানে বসবাস করিত। সুতরাং আর্য্য অর্থে কৃষ্টি বা চাষীও বুঝায়। ইউরোপীয় ভাষায়ও আর্য্য শব্দ চাষী অর্থে ব্যবহৃত হয়। অমরার্থ চন্দ্রিকা অনুসারে আর্য্য অর্থ "মহাকুলকুলীনার্য্য সভ্য সজ্জন সাধবঃ।" বাচস্পতি মিশ্রের টীকা অনুসারে "আরাজ্জপতাস্তত্বেভ্য ইত্যার্থা, আর্য্যমতির্যস্য আর্য্য-মতি, কর্ত্তব্যমাচরণ কামকর্ত্তব্যমনাচারণ তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারো যঃ সঃ আর্য্য ইতি স্মৃতঃ।" নিরুক্ত অনুসারে "আর্য্যঈশ্বরপুত্রঃ।"

প্রথমে বাল্মীকি স্বয়ং কৈকেয়ীকে 'অনার্য্যা' বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। বাল্মীকি বলিয়াছেন, রাম কৈকেয়ীর প্ররোচনায় বন গমন স্থির করিলেন। বন গমনের প্রাক্কালে সংজ্ঞাহীন পিতা রাজা দশরথ এবং অনার্য্যা কৈকেয়ীকে প্রণাম করিলেন।

রাক্ষস কি অনার্য্য ?

বন্দিত্বা চরণৌ রাজ্ঞো বিসংজ্ঞস্য পিতুস্তদা।
কৈকেয়্যাশ্চাপ্যনার্য্যয়া নিপপাত মহাদ্যুতিঃ ॥২।১৯।২৮

বাল্মীকি এখানে কৈকেয়ীকে অনার্য্যা অর্থাৎ সম্মানের অযোগ্যা বলিয়াছেন।

রাক্ষসরাজ-ভ্রাতা বিভীষণ সীতাহরণের জন্য রাবণকে নিন্দা করিলেন। রাবণ ইহার জন্য আত্মীয় হইলেও ক্রূর স্বভাব বিভীষণের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য অনুচিত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

যথা পুষ্করপত্রেষু পতিতাস্তোয়বিন্দবঃ
ন শ্লেষমধিগচ্ছন্তি তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্ ॥ ৬।১৬।১১

এখানে অনার্য্য অর্থে সৌহার্দ্দ্যবিহীন বুঝাইয়াছে।

শূর্পণখা লক্ষ্মণের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিলে লক্ষ্মণ পরিহাস করিয়া তাঁহাকে রামচন্দ্রের দ্বিতীয় ভার্য্যা হইতে পরামর্শ দিলেন। তৎক্ষণাৎ কামপীড়িতা শূর্পণখা রামচন্দ্রের পার্শ্বে উপবিষ্টা সীতাকে ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সীতা ভয়ে কম্পিতা হইলেন। রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে বলিলেন—

ক্রূরৈরনার্য্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন।
ন কার্য্যঃ পশ্য বৈদেহীং সৌম্যজীবিতম্ ॥৩।১৮।১৯

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে অনার্য্য শূর্পণখার সহিত পরিহাস করিতে নিষেধ করিলেন।

এখানে অনার্য্য শব্দে শূর্পণখাকে বুঝাইয়াছে; শব্দটি বিশেষ্যও হইতে পারে, বিশেষণও হইতে পারে। কিন্তু শব্দটি জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

সুগ্রীব বালীর মৃত্যুর পরে তারার সঙ্গে বিলাসে মত্ত হইয়া সীতা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে অনার্য্য বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

অনার্য্যস্ত্বং কৃতঘ্নশ্চ মিথ্যাবাদী চ বানর।
পূর্বং কৃতার্থো রামস্য ন তৎপ্রতিকরোষি যৎ ॥ ৪।৩৪।১৩

এখানে অনার্য্য শব্দের অর্থ কৃতঘ্ন।

রাবণ সীতাকে ছলনা করিবার জন্য তাঁহার মায়াবিদ্যা বিশারদ বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক অনুচরকে শ্রীরামের মুণ্ড রচনা করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীরামের ছিন্নমুণ্ড সম্মুখে স্থাপন করিয়া রাবণ সীতাকে বিভ্রান্ত করিলেন। সীতা সখেদে বিলাপ করিয়া বলিলেন—

মম হেতোরনার্য্যায়া অনঘঃ পার্থিবাত্মজঃ।
রামঃ সাগরমুত্তীর্য্য বীর্য্যবান্ গোষ্পদে হতঃ ॥ ৬।৩২।২৮।

হে নিষ্পাপ রাঘব, আমার মত দুর্ভাগিনীর জন্য তুমি সাগর লঙ্ঘন করিয়া গোষ্পদে নিহত হইয়াছ।

এখানে সীতা নিজেকে অনার্য্যা অর্থাৎ দুর্ভাগিনী বলিয়া আত্মনিন্দা করিয়াছেন।

একদা রাবণ কুশধ্বজ ঋষির কন্যা বেদবতীকে কেশাকর্ষণ করিয়া অপমান করিয়াছিলেন। বেদবতী ক্রুদ্ধা হইয়া রাবণকে অভিশাপ দিয়া বলিয়াছিলেন—

ধর্ষিতায়াস্ত্বয়ানার্য্য ন মে জীবিতমিষ্যতে।
রক্ষস্তস্মাৎ প্রবেক্ষ্যামি পশ্যতস্তে হুতাশনম্ ॥ ৭।১৭।৩০

হে অনার্য্য রাক্ষস! তুমি আমাকে ধর্ষিতা করিয়াছ, কিন্তু আমার প্রাণ হরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমার সম্মুখে আমি জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

এখানে রাবণকে অনার্য্য রাক্ষস বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। অনার্য্য অর্থাৎ দুশ্চরিত্র।

মহাভারতে আছে—বৃত্তেন হি ভবত্যার্য্যো ন বিদ্যয়া।

উদ্-৯০ অঃ, ৫০ শ্লোক।

সুতরাং দেখা যায় যে রাক্ষসকে অনার্য্য জাতিরূপে বাল্মীকি চিত্রিত করেন নাই। কারণ কৈকেয়ী সীতা, শূর্পণখা, বিভীষণ, রাবণের প্রতি অনার্য্য শব্দ প্রযোজিত হইয়াছে। অথচ বাল্মীকি বানরদিগকে আর্য্যরক্ত সম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় বাল্মীকির মতে রাক্ষস অনার্য্য জাতি নহে।

রামায়ণ নানা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন দৃষ্টিতে রামায়ণ মহাকাব্য, ধর্ম্মগ্রন্থ, সভ্যতার ইতিহাস, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন বিরোধের কাহিনী। রামায়ণ প্রধানতঃ মহাকাব্যরূপে আলোচিত হয়। বহু হিন্দু রামায়ণকে ধর্ম্মগ্রন্থরূপে শ্রদ্ধা করেন।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে রামায়ণ

অনেকে রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবানের পূর্ণ অবতাররূপে পূজা করেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং বিষ্ণু রাবণবধের নিমিত্ত মানবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং ধর্ম্মের জয়ঘোষণা করেন। কেহ রামায়ণকে সমসাময়িক ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার দর্শন বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহাদের মতে রামায়ণ আর্য্যজাতির জীবনবেদ। কেহ বা রামায়ণের মধ্যে আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার সংঘাতের ইতিবৃত্তের সন্ধান করেন। "আর্য্য" সভ্যতার প্রতীক ছিলেন অযোধ্যার রাজা দশরথ তনয় রামচন্দ্র। "অনার্য্য" সভ্যতার প্রতীক বিশ্রবা মুনির পুত্র লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণ। পরিশেষে রামায়ণে আর্য্য সভ্যতার বিজয় ঘোষিত হইয়াছে। কোন কোন ইউরোপীয় মনীষী রামায়ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ঋষি বিশ্বামিত্রের ও ব্রাহ্মণ ঋষি বশিষ্ঠের দ্বন্দ্বের অন্তরালে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংঘাতের ইঙ্গিত পাইয়াছেন। আমার ধারণা, উত্তর ভারতীয় সভ্যতা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে প্রচারের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস রামায়ণের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়; রামায়ণে আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

অবশ্য উপরোক্ত যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনে রামায়ণ আলোচিত হইতে পারে এবং প্রত্যেকটি আলোচনাই যুক্তিবহ

হইবে। রামায়ণ মহাকাব্য এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অলঙ্কার শাস্ত্রে বর্ণিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণই রামায়ণে বিদ্যমান। যথা—মহান আদর্শ, শুভ উদ্দেশ্য, লোকশিক্ষা, নায়ক-নায়িকার উন্নত চরিত্র, ঘটনার সুশৃঙ্খল সমাবেশ, সুললিত ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণই রামায়ণে বিদ্যমান। যদি সাহিত্যিক রামায়ণকে একখানি অমরকাব্য রূপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, নিশ্চয়ই তিনি নিরাশ হইবেন না। Griffith, Grisso অথবা গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতি মনীষী রামায়ণের মূলবস্তু লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

রামায়ণ মহাকাব্য

ধর্ম্মপ্রাণ ভগবদ্বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার-রূপে এবং ন্যায় ও ধর্ম্মের রক্ষকরূপে অর্ঘ্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে অবিসংবাদিত ভাবে সর্ব্বকালে, সর্ব্বক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিয়া তৃপ্তি পাইবেন, যেমন তুলসীদাস অথবা কৃত্তিবাস পাইয়াছেন। রামায়ণ আলোচনার মধ্য দিয়া এই দুই মহাজন ভারতীয় মনের অন্তর্বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছেন।

রামচন্দ্র-ভগবান

যদি কেহ ভারতীয় সভ্যতাকে রামায়ণের দর্পণে প্রতিফলিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি রামায়ণের আখ্যান বস্তুর মধ্যে ভারতীয় ধর্ম্মের আদর্শ, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষার চিত্র দেখিতে পাইবেন, যথা—রবীন্দ্রনাথ, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী দেখিয়াছেন।

রামায়ণ ভারতীয় সভ্যতার দর্শন

আমি আলোচ্য গ্রন্থে রামায়ণ বর্ণিত রাক্ষসের সভ্যতা আলোচনা করিয়াছি। রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা আলোচ্য গ্রন্থে নয়টি অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়—রাক্ষসের জন্মকথা। এই অধ্যায়ে রাবণের পিতৃমাতৃ পরিচয়, রাবণের পরিবারে সর্ব্বভারতীয় বিবাহ সম্বন্ধের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। রাবণের পিতামহ পুলস্ত্য, পিতা বিশ্রবা, মাতা সুমালী রক্ষঃকন্যা কৈকসী; বিশ্রবামুনির অন্যপুত্র ভরদ্বাজ ঋষিকন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভজাত সন্তান যক্ষরাজ কুবের।

দ্বিতীয় অধ্যায়—রাক্ষসের রূপ। এই অধ্যায়ে রামায়ণে উল্লিখিত প্রধান প্রধান রাক্ষসের রূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—তাড়কা, বিরাধ, কবন্ধ, অয়োমুখী, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা, রাবণ। অশোক বনে চেড়ীর রূপও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাক্ষস ছিল মায়াবী, ইচ্ছারূপী। শূর্পণখার মুখ হইতে সীতার বর্ণনার মাধ্যমে রাক্ষসের রূপাদর্শের মনোরম চিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়—লঙ্কার ঐশ্বর্য্য। এই অধ্যায়ে লঙ্কা বর্ণনার মাধ্যমে রাক্ষসের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা আলোচিত হইয়াছে। লঙ্কার নির্ম্মাণ-কৌশল, লঙ্কা-রক্ষার ব্যবস্থা, সৈন্য, রথ, লঙ্কার পথ, প্রাচীর, প্রাসাদ, বন, উপবন, উদ্যান, রাক্ষসরাজের বাসভবন, ভোজনশালা, পানশালা, প্রমোদশালা, শয়নশালা, রাবণের ভোজ্য, পানীয়, সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, ইত্যাদি বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায় বিশেষভাবে আলোচনা করিলে রাক্ষসদের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষের চিত্র পাওয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট ঃ—রাক্ষসের অস্ত্রশস্ত্র।

চতুর্থ অধ্যায়—রাক্ষসের সমাজ জীবন। রাক্ষস সমাজ ছিল পরিবার কেন্দ্রিক। তাহাদের সমাজ ছিল পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী সমন্বিত গোষ্ঠিবদ্ধ। দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী কুম্ভীনসী ছিলেন রাবণের গৃহে প্রতিপালিতা এবং তাঁহার সম্মান রক্ষার্থ রাবণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

রাক্ষসের সম্প্রদায় বিভাগ ঃ—আদি পুরুষ ভেদে রাক্ষস ছিল পৌলস্ত্য, আগস্ত্য, বৈশ্বামিত্র গোত্র সম্ভূত।

রাক্ষসের জাত-কর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, কৌলিক আচার ছিল মানুষের অনুরূপ। সমাজে নারীর স্থান—নারীর আদর্শ, বিবাহ, জীবন যাত্রা, নারীর বসন ভূষণ—এই অধ্যায়ে বর্ণিত।

পঞ্চম অধ্যায়—রাক্ষসের রাষ্ট্র জীবন। রাবণের শাসন ছিল রাজতান্ত্রিক। রাবণের তিনপ্রকার রাজ্য ছিল—স্বয়ং-শাসিত, প্রতিনিধি-শাসিত এবং বিজিত অথচ প্রত্যর্পিত রাজ্য। রাবণের রাজসভা, মন্ত্রণা-সভা, সিংহাসন, প্রহরী, শোভাযাত্রা, আড়ম্বর, রীতি-নীতির বর্ণনা চমৎকার। রাজা প্রজার সম্বন্ধ—রাজধর্ম্ম (রাবণ), ভ্রাতৃধর্ম্ম (কুম্ভকর্ণ), মানবধর্ম্ম (বিভীষণ); রাক্ষসের রাজনীতির বিভিন্ন বিভাগ—দূতের প্রতি আচরণ, বিচারনীতি ; রাবণের রাজ্যে প্রজার অধিকার ; রাবণের রাজ্যে কোন বিদ্রোহের উল্লেখ নাই। রাবণের প্রজা—রাক্ষস, যক্ষ, দানব, ঋষি, অপ্সরা, নাগ, দৈত্য, মানব—সকল শ্রেণীর জীবই রাবণের প্রজা ছিল। রাক্ষসের সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রজীবন ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়—রাক্ষসের ধর্ম্ম জীবন। ধর্ম্মের চারিটি অংশ—উপাস্য, উপাসনা, উপাসক ও সম্প্রদায়। এই অধ্যায়ে রাক্ষসের ধর্ম্মবিশ্বাস, রাক্ষসের উপাস্য ও উপাসনা বর্ণিত। রাবণের উপাস্য ছিলেন ব্রহ্মা ও শিব ; মেঘনাদের উপাস্য ছিলেন শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, যম। রাক্ষসের উপাসনা বিধি—বেদাধ্যয়ন, মন্ত্রোচ্চারণ, যাগ যজ্ঞ, তপশ্চর্য্যা, ধ্যান, সন্ন্যাস। নিকুম্ভিলা যজ্ঞের বর্ণনা। রাক্ষসের পূজা-বিধি, পুণ্যস্নান, নৃত্য গীত, পশুবলি। উপাসক রাক্ষস—বেদধ্যায়ী, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত। উপাসকের জীবনধারা,—শিখা সংলগ্ন, মুণ্ডিত কেশ, চন্দন চর্চ্চিত ললাট, অজিন চর্ম্ম পরিহিত, নিরামিষাশী,

নিত্যস্নায়ী। রাক্ষসের ধর্ম্ম সম্প্রদায়—উপাস্থ ভেদে সম্প্রদায় ছিল না। রাক্ষসেরা অভিশাপ দিতে পারিত না, কিন্তু অভিশাপ রাক্ষসের উপর কার্য্যকরী হইত।

সপ্তম অধ্যায়—রাক্ষসের প্রেতকৃত্য। রাক্ষসের পরলোকে বিশ্বাস ছিল—পুনর্জন্ম, পাপ পুণ্য ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস। পরলোকে সদ্‌গতির জন্য রাক্ষসেরা প্রেতকৃত্য করিত। রাক্ষসের সৎকার—শব সমাধি, শব দাহ, শব জলে নিক্ষেপ। বিভিন্ন প্রকার প্রেতকৃত্য—বিরাধ, কবন্ধ, রাবণ ও রাক্ষস সৈন্যের বিভিন্ন প্রকার সৎকার। মানবরাজ দশরথ, বানররাজ বালি, পক্ষিরাজ জটায়ু ও রাক্ষসরাজ রাবণের সৎকার সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা।

রাক্ষসের শ্রাদ্ধ—মানুষ, বানর, পক্ষী ও রাক্ষসের তর্পণ, পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ।

অষ্টম অধ্যায়—রাবণ চরিত্র। এই অধ্যায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাক্ষস রাবণের চরিত্রের মাধ্যমে রাক্ষস সভ্যতার পরিপূর্ণ রূপ চিত্রিত হইয়াছে—রাবণের জন্ম, ব্রহ্মচর্য্য, বেদ অধ্যয়ন, তপশ্চরণ, যাগ যজ্ঞ, ধর্ম্মবিশ্বাস, গার্হস্থ্য জীবন, দিগ্বিজয়, রাজনীতি, ব্যক্তিগত গুণাগুণ, সীতাহরণের যুক্তি, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। রাক্ষসের প্রতি বাল্মীকির দৃষ্টিভঙ্গী।

পরিশিষ্ট :—যক্ষ (কুবের), অপ্সরা প্রভৃতির কথা বলিয়াছি। কুবেরের জীবনী রাবণের চরিত্র স্ফুটনের জন্য বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অপ্সরা, পিশাচ প্রভৃতি জাতির উল্লেখ নানাগ্রন্থে আছে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে রাক্ষসের সমাজ সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত সংবাদ বিভিন্নভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতার বিবরণে আমি সমসাময়িক ভারতের মানব ও বানর সভ্যতার সঙ্গে রাক্ষস সভ্যতার তুলনা ইচ্ছা করিয়াই করি নাই। কাহাকেও উচ্চ বা নীচ প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য আমার নাই। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়াই আমি তথ্য প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি।

উপসংহার

রাক্ষস ও মানব একই রক্ত সঞ্জাত; অবশ্য তাহাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। রাক্ষসের সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ ছিল। রাক্ষস রাষ্ট্র সুশাসিত ছিল। মানব ও রাক্ষসের ধর্ম্মবিশ্বাস একই রূপ ছিল; মানব ও রাক্ষসের ধর্ম্মের উপাস্য এবং উপাসনা বিধিও একপ্রকার ছিল; কিন্তু ধর্ম্মের উদ্দেশ্য পৃথক ছিল। রাক্ষসের ধর্ম্মাচরণ বা উপাসনার প্রধান প্রেরণা ছিল শক্তি অর্জ্জন এবং জীবন উপভোগ। রাক্ষসের প্রেতকৃত্য প্রায়ই মানুষের প্রেতকৃত্যের অনুরূপ ছিল। রাক্ষস ও রাবণের সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা অধিকাংশই কল্পনা মিশ্রিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী

মহালয়া—১৩৬৬ সন।

প্রথম অধ্যায়

রাক্ষসের জন্মকথা

ভূমিকায় উক্ত হইয়াছে—পুরাকালে প্রজাপতি অর্দ্ধেক জলভাগ ও অর্দ্ধেক স্থলভাগ সৃষ্টি করিলেন। তারপর তিনি প্রজাপুঞ্জ রক্ষার জন্য কতকগুলি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রাণীগুলি ক্ষুধা পিপাসা এবং ভয়ে পীড়িত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা কি করিব ?" ব্রহ্মা সহাস্যে তাহাদিগকে কহিলেন—"হে জীবগণ! তোমরা যত্ন সহকারে মানবগণকে রক্ষা কর।" তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অক্ষুধার্ত্ত জীব "রক্ষামঃ"—এই কথা বলিল; অন্য জীবগুলি বলিল—"যক্ষামঃ"—অর্থাৎ ভক্ষণ করিব। ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষামঃ' বলিয়াছ, তাহারা রাক্ষস নামে আর যাহার 'যক্ষামঃ' বলিয়াছ তাহারা যক্ষ নামে পরিচিত হইবে।" 'যক্ষামি' শব্দের অন্য অর্থ "পালয়ামি" পালন করিব। রাজশেখর বসু মহাশয় 'পালন করিব'—এই অর্থে যক্ষগোষ্ঠীর কার্য্যাবলি আলোচনা করিয়াছেন।

রাক্ষস সংজ্ঞা

এই নামকরণ হইতে রক্ষ ও যক্ষ বংশের ও চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, যক্ষ বা রক্ষ কেহই জাতিগতভাবে সৎ বা অসৎ ছিল না। ব্যক্তির গুণাগুণ হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। যক্ষ কুবের তপস্যা দ্বারা দেবগণের পর্য্যায়ে উন্নীত হইলেন—ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কুবেরকে যজ্ঞভাক্ এবং চতুর্থ লোকপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

বায়ুপুরাণের উল্লেখ অনুসারে যক্ষ ও রক্ষ দুই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মাতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। কনিষ্ঠ তনয় মাতাকে রক্ষা করিবার জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিবৃত্ত করিল। কশ্যপ এই সংবাদ

অবগত হইয়া যে পুত্র মাতাকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল তাহার নামকরণ করিলেন 'যক্ষ' (যক্ষ্ ধাতু অর্থ ভক্ষণ) এবং অন্য যে পুত্র মাতাকে রক্ষা করিয়াছিল তাহার নাম রাখিলেন "রক্ষ" (রক্ষ ধাতু অর্থে রক্ষা করা)। সুতরাং বায়ুপুরাণের উল্লেখ হইতে দেখা যায় যে রক্ষ ও যক্ষ একই পিতামাতার সন্তান। কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে রক্ষ ও যক্ষ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শব্দ দুইটি বিপরীতার্থক।

বায়ুপুরাণে রাক্ষস

একদা কশ্যপপুত্র যক্ষ আহারের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছিল। সেই সময়ে দুইজন পিশাচের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পিশাচদ্বয় কশ্যপপুত্র যক্ষের পরিচয় অবগত হইয়া তাহার সহিত নিজ নিজ কন্যা ব্রহ্মধনা ও যাতুধনার বিবাহ দিল। যাতুধনার বংশধরগণ যাতুধান নামে পরিচিত হইল। ইহারা ছিলেন "যাতুধানস্য দৌহিত্রাঃ"। (রামা ৬/১১৪/৮১)। রাক্ষসী হিড়িম্বাকে যাতুধান বলিয়া উল্লেখ করিলে হিড়িম্বা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন (মহা ১।১৬৭।১৭)।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের চতুর্থ সর্গে উল্লেখ আছে যে রাক্ষসবংশের আদিপুরুষ ছিলেন হেতি। হেতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রহেতি সংসার ত্যাগ করিয়া তপোবনে তপস্যা করিয়াছিলেন। হেতি কালের ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ভয়ার গর্ভে হেতির ঔরসে বিদ্যুৎকেশ নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যা নাম্নী গন্ধর্ব্বের কন্যাকে বিবাহ করেন। সুকেশ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু গন্ধর্ব্বীমাতা মন্দার পর্ব্বতে পুত্র সুকেশকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। শিশু সুকেশের ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া দয়া বশে মহেশ্বর ও উমা সুকেশকে অমরত্ব বর প্রদান করিলেন। যৌবনে উপনীত হইয়া সুকেশ গ্রামণী নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা অনুপম লাবণ্যময়ী দেববতীকে

উত্তরকাণ্ডে রাক্ষসের জন্মকথা

বিবাহ করেন। দেববতীর গর্ভে তিনটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল— মাল্যবান, মালী এবং সুমালী। সুমালীর কন্যা কৈকসীর গর্ভে, পুলস্ত্য নন্দন বিশ্রবার ঔরসে রাবণের জন্ম। বিশ্রবা মুনি এবং কৈকসী রাক্ষসীর বিবাহ ভারতীয় সমাজে মানব এবং রাক্ষসের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বিবাহের প্রথম উদাহরণ। এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে উল্লিখিত বংশপঞ্জী হইতে মানব ও রাক্ষস জাতির সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (২৯/৩২) এবং বায়ুপুরাণের (৩১/৩২) উল্লেখ আছে যে, কশ্যপের ঔরসে এবং দক্ষসুতা তিষ্যার গর্ভে বহু যক্ষ এবং রক্ষ সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, দেবতা এবং রাক্ষস একই পিতৃপুরুষের সন্তান। কশ্যপ-ত্বিষ্যার সন্তানগণ ত্বিষ্যিমন্ত শ্রেণীয় দেবতার জ্ঞাতি। রাক্ষসের শ্রেণী বিভাগ অনেক সময় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে; যথা—পুলস্ত্যবংশধর রাক্ষসগণ পৌলস্ত্য, অগস্ত্যবংশের রাক্ষসগণ আগস্ত্য, বিশ্বামিত্র বংশধর রাক্ষসগণ বৈশ্বামিত্র নামে পরিচিত। এই কিংবদন্তী মানব ও রাক্ষসের সমগোত্রত্ব ইঙ্গিত করে। পরবর্ত্তীকালে বহু প্রাক্-আর্য্য বা আর্য্যেতর জাতি আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহারা বিভিন্ন মুনি ঋষি প্রবর্ত্তিত পথ ও মত অনুসরণ করিত এবং নিজেদের সেই সকল ঋষি ও মুনির গোত্রজাত বলিয়া আত্মপরিচয় দিত; যেমন বিশ্বামিত্রের প্রবর্ত্তিত মত ও পথ অনুসরণকারিগণ বৈশ্বামিত্র বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। ইহা বিভিন্ন ভারতীয় প্রাক্-আর্য্য গোষ্ঠীর আর্য্যীকরণের অন্যতম উদাহরণ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের রাক্ষস

মন্দেহ নামক অন্য একটি রাক্ষসশ্রেণীর নাম পাওয়া যায়। তাহারা পর্ব্বতশিখরে বাস করে, প্রত্যুষে জলমধ্যে বিলীন হইয়া যায়। সুগ্রীব সীতা অন্বেষণের জন্য দক্ষিণ নৈঋর্ত রাক্ষসদের দেশে

চর প্রেরণ করেন। তাহারা কুবেরের অনুচর। ক্রোধবশা রাক্ষস গোষ্ঠী উত্তর দেশবাসী। রাবণ স্বয়ং নৈঋর্ত বা দক্ষিণ দেশীয় রাক্ষস ছিলেন।

পদ্মপুরাণে রাক্ষস

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে (৩য় স্কন্ধ) ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি কার্য্যে নিরত ছিলেন। একদা তিনি ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিলেন এবং ক্ষুধার তাড়নায় সমস্ত অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তখন অন্ধকারের মধ্যেই ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিলেন। সেই অন্ধকারে মধ্যে বিকৃতাকার ও ক্ষুধার্ত্ত প্রজাকুল সৃষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকেই 'যক্ষামঃ' বলিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। অপর কোন প্রজা 'রক্ষামঃ' বলিয়া এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিল। পরবর্ত্তীকালে যাহারা পিতামহকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা যক্ষ নামে পরিচিত হইল। অন্যথা যাহারা নিষেধ করিয়াছিল, এবং রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল তাহারা রক্ষোরূপে পরিচিত হইল।

সুতরাং দেখা যায় যে কোন কোন রাক্ষসের শুভবুদ্ধি ছিল এবং তাহারা পুণ্যকার্য্য করিত। ধূম্রবর্ণ রাক্ষসগণ কুবেরের ধনরক্ষা করিত। মহাভারতে উল্লেখ আছে, রাজা কুবেরের আদেশে রাক্ষসগণ রক্ষকের কার্য্যও করিত। ক্রোধবশা রাক্ষসগণ স্বর্গের

বিভিন্ন-বৃত্তি রাক্ষস

সম্পদ রক্ষা করিয়াছিল। সূর্য্যদেবতার রক্ষকরূপেও রাক্ষসগণ কাজ করিয়াছে। একদা সূর্য্যদেব তাঁহার পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে রক্ষার জন্য রাক্ষসদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থে দৈত্য দানব অসুর পিশাচদিগকে এক পর্য্যায়ে উল্লেখ করা হয়। মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণে রাক্ষসদিগকে অধিকতর মানবীয়ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। মহাভারতের যুগে রাক্ষসের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প। মহাভারতে জটাসুর, বকাসুর, অলায়ুধ, কীরমীর, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ এবং বিরূপাক্ষেরই উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাভারতে রাক্ষসগণ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। অথচ রাক্ষসকন্যা 'হিড়িম্বা' ভীমকে বিবাহ করিয়াছেন। রামায়ণে যেমন রাক্ষসদের বিরাট শিল্প ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, মহাভারতে তেমন পাওয়া যায় না। মহাভারতের রাক্ষস পর্ব্বতে, বনে এবং দুর্গম স্থানে বাস করিত। তাহারা দেবস্থান অপবিত্র করিত, মুনি ঋষির তপোভঙ্গ করিত।

মহাভারতে রাক্ষস

অথচ জরা রাক্ষসীকে একজন ব্রাহ্মণ দানবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুত্রকে নিযুক্ত করিলেন। এখনও বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্ম্মে অপদেবতার অপদৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য জরা রাক্ষসীর প্রতীক গৃহপ্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত করা হয়। এই জরা রাক্ষসী গৃহদেবীরূপে পূজার অধিকারিণী।

রামায়ণ মহাভারতের বহুস্থানে উল্লেখ আছে যে মানব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা শাপ ভ্রষ্ট হইয়া রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে যথা—বিরাট, কবন্ধ, তাড়কা। বিশ্রবার শাপে কৈকসীর পুত্র রাবণ 'দারুণ রূপ' ও 'ক্রূর প্রকৃতি' লাভ করিয়াছিল।

রাক্ষসদের মধ্যে পাপ পুণ্যের একটা আদর্শও ছিল। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় দেখা যায় নরমাংসভোজী প্রাণী এবং পিশাচগণ রাবণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। গন্ধর্ব্ব এবং কিংপুরুষ প্রভৃতি বিভীষণ ও রাবণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল।

(মহা ৩-২৮৬-৩৫)

ব্রহ্মরাক্ষসগণ যজ্ঞ ও তন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। তাহারা ঋষিদের যজ্ঞাদিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিত। ব্রহ্মরাক্ষসী ছিল উপহারিণী, রক্তকর্ণা, মহাজিহ্ব। তাহারাই ব্রহ্মরাক্ষসের জননী। ব্রহ্মরাক্ষসগণ প্রকৃতিগতভাবে পাপচারী,

ব্রহ্ম রাক্ষস

কারণ, তাহারা পাপসম্ভব। সন্তানের ভ্রূণস্থ অবস্থায় মাতা যদি কোন পাপাচরণ করে, তবে সন্তান ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মায়। যদি কোন যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্মরাক্ষস যে যজ্ঞ নষ্ট করে না।

প্রমথ নামক রাক্ষসগণ অপ্সরা গোত্রীয়। অপ্সরা চিত্রগুপ্তের সঙ্গে প্রমথগণ বিশেষভাবে জড়িত। শিব প্রমথগণের অধিপতি। শিবের অন্য নাম প্রমথনাথ (মহা-১২-২৮)। প্রথমগণ অখাদ্যভোজী যজ্ঞ অপবিত্রকারী। উত্তর দিক মস্তক স্থাপন করিয়া শায়িত ব্যক্তি এবং বৃক্ষ নিম্নে শয়নকারী ব্যক্তিগণের অনিষ্ট করাই প্রমথদের কাজ। এই প্রমথগণ গোরচনা, যজ্ঞাগ্নি, ব্যাঘ্রনখ ও কৃষ্ণছাগচর্ম্মকে ভয় করে।

প্রমথ রাক্ষস

রাক্ষস ও পিশাচগণ রক্তপায়ী, নৃত্যকুশল, পরস্পর সাহায্যকারী; পিশাচ অপেক্ষা রাক্ষস কুলীন। পিশাচ বিবাহ অপেক্ষা রাক্ষস বিবাহ বরণীয়। তবে পিশাচের মধ্যেও সৎকৃতি ছিল। মহাভারতে আছে (৩।১২৯।৪) পিশাচ রক্তপান করে না। তাহারা ফলাহারী; তাহারা শিবপুত্র স্কন্দ দেবতার অনুচর এবং শ্বেতপর্ব্বতের রক্ষাকর্ত্তা। মহাভারতে একজন শুভবুদ্ধি পিশাচিনীর উল্লেখও পাওয়া যায়। এই পিশাচিনী একজন ব্রাহ্মণীকে পুণ্য জলধারার সন্ধান দিয়াছিল (মহা ৩।১২৯।৮)। পিশাচিনীদের মধ্যে একজন তীর্থ পালিকা ছিল; তাহারা কৃষ্ণভক্ত ভিন্ন অন্য কাহাকেও সেই তীর্থে প্রবেশ করিতে দিত না। পরে এই পিশাচগণ অপ্সরাতে পরিণত হয় (মহা ১২।১৩৬।৩৪)।

পিশাচ

যক্ষ-রক্ষদের মধ্যে ব্যক্তিগত গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়া শ্রেণীবিভাগ করা সমীচীন হইবে না। দুইটি শাখাই পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত ছিল। প্রায় প্রত্যেকটি রাক্ষস প্রধান সঙ্কর বা মিশ্র। কোন শাখাই নিরবচ্ছিন্ন সৎ বা অসৎ ছিল না। তাহার কর্ম্মদ্বারা সৎ বা অসৎ পর্য্যায় স্থির করিতে হইলে সাধারণতঃ রাক্ষসগণ শেষ পর্য্যন্ত অপকর্ম্মশীল বলিয়াই মনে হয়। তবে রাক্ষসগণ দেবতাদিগকে সাহায্য করিয়াছে, এমন উল্লেখও আছে, যদিও সাধারণতঃ রাক্ষসগণ ছিল দেবতাদের শত্রু। নামতঃ রাক্ষস শব্দের ধাতুগত অর্থ রক্ষাকর্ত্তা হইলেও তাহারা প্রায়ই বিনাশকর্ত্তা।

রাবণের জন্মকথা

কাশ্যপ-দিতিসুত ময়দানব মৃগয়া-বিহারী লঙ্কাধিপতি রাবণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি কে ?"

রাবণ বিনীত ভাবে আত্মপরিচয় দিলেন—"আমি ব্রহ্মার পৌত্র পুলস্ত্যতনয় বিশ্রবা মুনির পুত্র ; আমার নাম দশানন"—

> অহম্ পৌলস্ত্যতনয়ো দশগ্রীবশ্চ নামতঃ।
> মুনের্বিশ্রবসো যস্ত তৃতীয়ো ব্রহ্মণোঽভবৎ ॥ রামা ৭।১২।১৫

ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য তৃণবিন্দুর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তান বিশ্রবা। বিশ্রবা মুনির একাধিক পত্নী। এক স্ত্রী ঋষি ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনী, অন্য স্ত্রী সুমালী-রক্ষ-কন্যা কৈকসী। দেববর্ণিনীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—নাম কুবের। তিনি যক্ষরাজ।

রাবণের পিতৃমাতৃ পরিচয়

কৈকসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তিন পুত্র—রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ এবং এক কন্যা শূর্পনখা। সুতরাং দেখা যায় যে রাবণ মানবের ঔরসে, রাক্ষসীর গর্ভ-জাত অর্থাৎ রাবণ রাক্ষসীমাতার সন্তান। বাল্মীকির সমকালে কোন কোন স্থলে ক্ষেত্র প্রাধান্য ছিল; বীজ ছিল গৌণ, ক্ষেত্র ছিল মুখ্য। অন্যদিকে যক্ষ কুবের ঋষি ভরদ্বাজকন্যা দেববর্ণিনী এবং বিশ্রবা মুনির পুত্র। সুতরাং কুবের ও রাবণ বৈমাত্র ভ্রাতা। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের মাতা ছিলেন পুষ্পোৎকটা, বিভীষণের মাতা ছিলেন মালিনী এবং শূর্পনখার মাতা ছিলেন রাকা।

যক্ষ, রক্ষ, দানব, দৈত্য, মানব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতকের মধ্যে (গোষ্ঠী) বিবাহ সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। রাক্ষসরাজ রাবণ স্বয়ং ময়-দানবের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করেন। মন্দোদরীর মাতা ছিলেন হেমা নাম্নী অপ্সরা। রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ প্রহ্লাদবংশীয় বৈরোচনবলি দানবের দৌহিত্রী বজ্রজ্বালাকে এবং বিভীষণ গন্ধর্ব্ব-রাজ শৈলুষের কন্যা সরমাকে বিবাহ করেন। সুতরাং রাবণের

পরিবারে মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানব ও অপ্সরার রক্তসংমিশ্রণ হইয়াছিল। রাবণের ভগিনী শূর্পনখার বিবাহ হয় পাতাল নিবাসী—(সুদূর দক্ষিণ) বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক কালকেয় বংশীয় দানবের সঙ্গে। বিভীষণের পত্নী সরমা মানস সরোবরের তীরবাসিনী। অতএব দেখা যায় যে রামায়ণের যুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ ছিল, দ্বীপবাসীদের সঙ্গেও তাহাদের সম্বন্ধ ছিল।

মানব ও রাক্ষসের বিবাহ

মানুষের সহিত রাক্ষসের বিবাহ বিষয়ে রামায়ণে বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ আছে। রাবণের দূতী হরিজটা রাক্ষসী রাবণের সহিত সীতার বিবাহ প্রস্তাব করিয়া বলিলেন—"হে সীতে, ত্রৈলোক্য ধনরাশি উপভোক্তা রাবণকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ কর এবং ধনরাশি উপভোগ কর।"

ত্রৈলোক্যবসুভোক্তারং রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।
ভর্ত্তারমুপসঙ্গম্য বিহরস্ব যথাসুখম্॥ ৫।২৪।৪

সীতা উত্তর দিলেন—"মানুষ কখনও রাক্ষসের পত্নী হইতে পারে না"— ন মানুষী রাক্ষসস্য ভার্য্যা ভবিতুমর্হতি। (৫।২৪।৮)

একদা স্বয়ং রাবণ সীতাকে বিবাহ প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন—"হে বৈদেহি, তুমি ধর্ম্মনাশের ভয়ে লজ্জিতা হইও না। কারণ তোমার ও আমার প্রণয় ধর্ম্মানুবন্ধ। এই বিবাহ ঋষিকর্ত্তৃকও অনুমোদিত।"

অলং ব্রীড়েন বৈদেহি ধর্ম্মলোপ কৃতেন তে।
আর্ষোঽয়ং দেবি নিষ্পন্দো যস্ত্বামভিভবিষ্যতি॥ ৩।৫৬।৩৬

অথচ রাবণের পত্নীদের মধ্যে কোন মানবীর উল্লেখ প্রত্যক্ষভাবে নাই। কিন্তু রামায়ণের একস্থানে উল্লেখ আছে যে রাবণের অনুগামিনী বহু বিপ্রকন্যা ছিলেন। হনুমান লঙ্কাপুরীতে রাবণের প্রমোদকক্ষে যে সমস্ত নারীদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বিপ্রকন্যাও ছিলেন।

রাজর্ষিবিপ্রদৈত্যানাং গন্ধর্ব্বানাঞ্চ যোষিতঃ।
রক্ষসাঞ্চাভবন্ কন্যাস্তস্য কামবশং গতাঃ॥ ৫।৯।৬৮

দণ্ডকারণ্যে শূর্পনখা রামচন্দ্রের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমিই তোমার উপযুক্ত ভার্য্যা; তুমি আমাকে ভার্য্যারূপে দেখ।"

অহমেবানুরূপা তে ভার্য্যারূপেন পশ্যতাম্। ৩।১৭।২৩

রামচন্দ্র রহস্য করিয়া বলিলেন—"আমি বিবাহিত, তুমি আমার অপত্নীক কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সপত্নীশূন্যা হইয়া স্বামীরূপে ভজনা কর।"

কৃতোদারোঽস্মি..............
শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণো.........
এনং ভজ বিশালাক্ষি ভর্ত্তারং ভ্রাতারং মম। ৩।১৮।১-৪

অনেক সময়ে উপহাসের অন্তরালেও সত্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকে। রামচন্দ্রের উপহাসের অন্তরালে তদানীন্তন যুগের সামাজিক রীতি ও বিবাহ বিধির ইঙ্গিত থাকা স্বাভাবিক। যদি সমাজে রাক্ষস ও মানবের বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকিত, তবে শূর্পনখা রামচন্দ্রের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিতেন না এবং রামচন্দ্র রহস্যচ্ছলেও লক্ষ্মণের সঙ্গে শূর্পনখার বিবাহ প্রস্তাব করিতে পারিতেন না।

ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতীকে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, ও নাগগণ বিবাহার্থে প্রার্থনা করিয়াছেন—

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
তে চাপি গত্বা পিতরং বরণং রোচয়ন্তি মে॥ ৭।১৭।১০

শূর্পনখাও সীতাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিবার জন্য তিনবার ভ্রাতা রাবণের নিকট প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছিলেন—"সীতা রাবণের উপযুক্ত ভার্য্যা এবং রাবণই সীতার উপযুক্ত স্বামী।"

সা সুশীলা বপুঃ শ্লাঘ্যা রূপেণা প্রতিমাভুবি।
তবানুরূপা ভার্য্যা সা ত্বঞ্চ তস্যাঃ পতির্বরঃ॥
যদি তস্যামভিপ্রায়ো ভার্য্যাত্বে তব জায়তে।
.....................ক্রিয়তাঞ্চ মহাবল।
সীতা তবানবদ্যাঙ্গী ভার্য্যাত্বে রাক্ষসেশ্বর॥ ৩।৩৪।২০, ২৫॥

অবশ্য পরস্ত্রীহরণ ও পরদার গমন রাক্ষসের সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং বিবাহাতিরিক্ত যৌন সম্বন্ধ যক্ষ, রক্ষ, মানব, গন্ধর্ব্ব, এবং দেবতাগণের মধ্যে বিভিন্নরূপে বিদ্যমান ছিল। রাবণ সীতাকে বলিয়াছেন—

স্বধর্ম্মো রক্ষসাং ভীরু সর্ব্বদৈব ন সংশয়ঃ।
গমনং বা পরস্ত্রীনাং হরণং সম্প্রমথ্য বা॥ ৫।২০।

বানরী, রাক্ষসী, ও যক্ষিণীর গর্ভে দেবতা, মানব, দানব সকলেই সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন, যথা—পবন-নন্দন হনুমান, অরুণ-নন্দন সুগ্রীব এবং ইন্দ্র-নন্দন বালি। ইঁহারা বানরীর গর্ভজাত সন্তান। রাবণাদি তিন ভ্রাতা ও ভগিনী মানবের ঔরসে রাক্ষসীর গর্ভজাত সন্তান। ময়দানব তাঁহার কন্যা মন্দোদরীকে স্বেচ্ছায় রাক্ষসরাজের হস্তে সমর্পন করিয়াছিলেন। রাবণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করেন।

দেবতার সন্তান

প্রজ্জ্বাল্য তত্র চৈবাগ্নিমকরোৎ পাণিসংগ্রহম্। ৭।১২।২০

রাক্ষসদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ বিধবা শূর্পনখা রামের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। রাবণ স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহার সহিত সীতার বিবাহ ঋষি-সম্মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তৎকালে বিধবা ভ্রাতৃবধূর সহিত সহবাস বিধি সম্মত ছিল; কারণ ভ্রাতার মৃত্যুর পর বানররাজ বালির বিধবা পত্নী তারার সহিত সুগ্রীব বিহার করিয়াছিলেন। রাবণের মৃত্যুর পরে রাম সীতাকে বলিলেন, "তুমি রাবণস্পর্শদোষদুষ্টা, গ্রহণের অযোগ্যা, তুমি লক্ষ্মণ ভরত বা শত্রুঘ্ন সহিত যথেচ্ছা বাস কর।" কিন্তু রামায়ণে মানব সমাজে বিধবা বিবাহের উল্লেখ নাই। বরং স্বামীর চিতায় সহমরণের উল্লেখ আছে। কুশধ্বজ দৈত্যপতি শম্ভু কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার পত্নী স্বামীর দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী রাবণকে বলিলেন—

রাক্ষসের বিধবা বিবাহ

শম্বুর্নাম ততো রাজা দৈত্যানাং কুপিতোঽভবৎ ॥
তেন রাত্রৌ শয়ানো মে পিতা পাপেন হিংসিতঃ ॥
ততো মে জননী দীনা তচ্ছরীরং পিতুর্মম।
পরিষ্বজ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥ ৭।১৭।১৩-১৫

অপ্সরা বহুভর্ত্তৃকা ছিল। একদা অপ্সরা রম্ভা কুবের পুত্র নল-কুবের কর্ত্তৃক আহূতা হইয়া অভিসারে চলিয়াছেন। পথে রাবণ তাঁহাকে কামার্থ আহ্বান করিলেন। রম্ভা উত্তর করিলেন—"আমি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, নলকুবেরের নিকট প্রতিশ্রুতা। আমি আপনার পুত্রবধূসমা। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।" রাবণ উত্তর দিলেন—"তুমি আমাকে গ্রহণ করিতে পার।" কারণ, অপ্সরা বহুভর্ত্তৃকা—

পতিরপ্সরসাং নাস্তি ন চৈকস্ত্রীপরিগ্রহঃ। ৭।৩১।৪০

ইহাতে বুঝা যায় যে অপ্সরার সঙ্গে রাক্ষসের বিবাহ হইতে পারিত। বাস্তবিক পক্ষে দেবতা, মনুষ্য, বানর, রক্ষ ও যক্ষের মধ্যে বিবাহ হইত। ইন্দ্র, যম এবং কুবের দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। রামায়ণের যুগে বিনিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের ঔরসে উৎপন্ন বহু বানরের বহু উল্লেখ আছে।

হরয়ো দেবগন্ধর্ব্বৈরুৎপন্নাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৬।২৮।৫

মনুষ্য, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, বানর প্রভৃতি জাতি বহুপত্নীক ছিল—ইহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র পুলোমা দৈত্যের কন্যা শচীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তান জয়ন্ত। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে সুর, অসুর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর জাতি বিভিন্ন ছিল। সীতা অশোকবনে হনুমানকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুর, অসুর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর জাতির মধ্যে তুমি কোন জাতীয় ?"

সুরাণামসুরাণাঞ্চ নাগগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্।
যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ কা ত্বং ভবসি শোভনে ॥ ৫।৩৩।৫

রাবণ ও মানুষের পূর্ব্বপুরুষ যে এক বংশজাত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। তাহাদের আচার ব্যবহার স্থানভেদে ও সভ্যতার স্তরভেদে বিভিন্ন ছিল। রামায়ণের যুগে একটি সর্ব্বভারতীয় সভ্যতা বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে রাক্ষস শব্দটি ব্যাপক ও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—জাতির নাম, গুণ, ভাব, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ইত্যাদি নানা-প্রকার অর্থে অত্যন্ত সহজভাবেই রাক্ষস শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে।

রাক্ষস শব্দের ব্যাপকতা

সামাজিক পরিভাষায় রাক্ষস শব্দটি দ্বারা এক প্রকার মানবগোষ্ঠী সূচিত হইয়াছে। রাক্ষসের জন্মকথা আলোচনায় আর্য্যেতর এবং প্রাকৃআর্য্য জাতির আর্য্যীকরণের বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত রহিয়াছে। আর্য্যীকরণের প্রয়াস বহুযুগ ধরিয়া ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। সেই দীর্ঘদিবসের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে, মহাকাব্যে, পুরাণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই বিষয়ের নানা প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বিভিন্ন যুগের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাক্ষসের জন্মকথা বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনার অন্তরালে একটি লঘিষ্ঠ সাধারণ সত্য নিহিত রহিয়াছে—অর্থাৎ রাক্ষসগণ মানবের সমপর্য্যায়ভুক্ত জীব ছিল। আর্য্যগণ দীর্ঘকাল চেষ্টার পর এই সমস্ত জাতিগুলিকে আর্য্যীকৃত করিয়াছিল। এই সমস্ত জাতিগুলিও কালক্রমে আর্য্যসংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যধর্ম্ম, দেবতা, পুরোহিত ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিল। বাল্মীকি বর্ণিত রামায়ণের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের অনুকূল বহু তথ্য নিহিত রহিয়াছে।

রাক্ষসের বংশ পরিচয়

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

রামায়ণ অনুসারে

রাবণের বংশ পরিচয়
পুলস্ত্য
(ভরদ্বাজঋষিকন্যা) দেববর্ণিনী = বিশ্রবা = কৈকসী (সুমালী রক্ষকন্যা)
কুবের
রাবণ = কুম্ভকর্ণ = শূর্পণখা = বিভীষণ =
(২) ধন্যমালিনী =
(১) মন্দোদরী
বজ্রজ্বালা
বিদ্যুৎজিহ্ব
সরমা
নিকুম্ভ
কলা (কন্যা)
মেঘনাদ
তরণীসেন
= সুলোচনা নাগকন্যা
অন্য স্ত্রীর সন্তান
আর্ক
(১) অতিকায়
দেবান্তক
পরান্তক
ত্রিশিরা
(২) অরিমর্দন
ময়দানব = হেমা অপ্সরা
সুকেতু যক্ষ
সুন্দ (অসুর)
তাড়কা = জম্ভ
দুন্দুভি
মায়াবী
মন্দোদরী = রাবণ
(বালী কর্ত্তৃক নিহত)
মারীচ
সুবাহু
হ্লাদ
বিরোচন
বলি
গন্ধর্ব্ব জব = শতহ্রদা
বজ্রজ্বালা = কুম্ভকর্ণ
বিরাধ
বিশ্রবা = ভরদ্বাজ কন্যা দেববর্ণিনী
মনিগ্রীব
নলকুবের
সুপ্রতীক
সার্ব্বভৌম
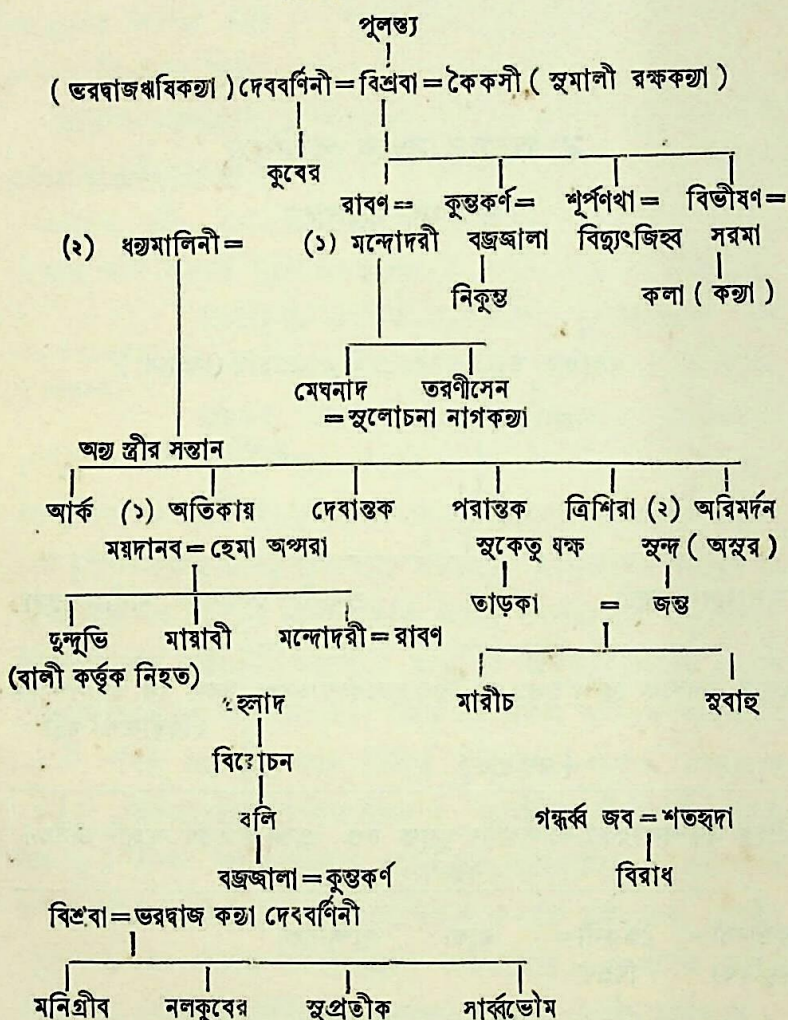
প্রথম অধ্যায়

রাক্ষসের রূপ

রাক্ষসের রূপ ঃ—রামায়ণে আমরা রাক্ষসের সন্ধান পাই সর্ব্বপ্রথম তাড়কা রাক্ষসীর বিবরণে। তাড়কা সুকেতু যক্ষের কন্যা।

তাড়কার রূপ

নিঃসন্তান সুকেতু তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে তাড়কা নাম্নী কন্যা প্রদান করেন। ব্রহ্মার বরে সেই কন্যা সহস্র মাতঙ্গ বলশালিনী হইলেন।

পূর্ব্বমাসীৎ মহাযক্ষঃ সুকেতুর্নাম বীর্য্যবান্।
অনপত্যঃ শুভাচারঃ স চ তেপে মহাতপঃ॥
পিতামহস্তু সুপ্রীতস্তস্য যক্ষপতেস্তদা।
কন্যারত্নং দদৌ রাম তাড়কাং নাম নামতঃ॥
দদৌ নাগসহস্রস্য বলঞ্চাস্যাঃ পিতামহঃ। ১।২৫।৫-৭

তারপর সেই যশস্বিনী কন্যা ষোড়শবর্ষে অপরূপ রূপ লাবণ্যময়ী হইলেন। তাঁহার সহিত জম্ভ নামক অসুরের পুত্র সুন্দের বিবাহ হইল। মারীচ নামে তাঁহাদের এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। যক্ষ ও অসুরের সন্তান মারীচও শাপহেতু রাক্ষস হইয়াছিল।

জম্ভপুত্রায় সুন্দায় দদৌ ভার্য্যাং যশস্বিনীম্॥
কস্যচিত্ত্বস্য কালস্য যক্ষী পুত্রং ব্যজায়ত।
মারীচং নাম দুর্দ্ধর্ষং যঃ শাপাদ্রাক্ষসোঽভবৎ। ১।২৫।৮-৯

এই লাবণ্যময়ী তাড়কার পিতা সুকেতু অগস্ত্য ঋষি কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাড়কা অগস্ত্যকে বধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ক্রুদ্ধা যক্ষিনী তাড়কা তখন ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অগস্ত্য ঋষি মহাক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, "অচিরে তোমার এই প্রকার ভীষণ রূপ হইবে, তুমি বিকৃতরূপা ও বিকৃতবদনা রাক্ষসী হইবে।"

অগস্ত্যঃ পরমামর্ষস্তাড়কামপি শপ্তবান্॥
পুরুষাদী মহাযক্ষী বিকৃতা বিকৃতাননা।
ইদং রূপং বিহায়াশু দারুণং রূপমস্তু তে॥ ১।২৫।১২-১৩

রাক্ষসী তাড়কা মহাবলধারিণী ছিলেন। তাড়কা এবং তাঁহার পুত্র মারীচ রাক্ষস রূপ ধারণ করিয়া মুনি ঋষিদের যজ্ঞ বিনাশ করিতেন; রাবণের সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ ছিল। যজ্ঞ বিনশন কর্ম্মে সুবাহু ও মারীচ রাবণের সহকর্ম্মী ছিল। বিশ্বামিত্র স্বয়ং দশরথের নিকট বলিয়াছিলেন যে বিশ্রবা পুত্র রাবণ, সুবাহু এবং মারীচ নামক মহাবল রাক্ষসদ্বয়কে যজ্ঞবিঘ্ন কার্য্যের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন।

সাক্ষাদ্বৈশ্রবণভ্রাতা পুত্রো বিশ্রবসো মুনেঃ।
যদা ন খলু যজ্ঞস্য বিঘ্নকর্ত্তা মহাবলঃ॥
তেন সঞ্চোদিতৌ তৌ তু রাক্ষসৌ চ মহাবলৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ যজ্ঞবিঘ্নং করিষ্যতঃ॥ ১।২০।১৮-১৯

তাড়কা বধের সময় বাল্মীকি তাড়কার রূপ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—বিকৃতাকায়, বিকৃতানন এই রাক্ষসগণ সন্ধ্যাকালে দুর্দ্ধর্ষনীয় হইয়া পড়ে।

রক্ষাংসি সন্ধ্যাকালে তু দুদ্ধর্ষাণি ভবন্তি হি। ১.২৬.২৩

রামচন্দ্র স্বয়ং তাড়কাকে শরবিদ্ধ করিয়া নিহত করেন। তাড়কার রূপ সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য বর্ণনা রামায়ণে নাই।

তাড়কার মৃত্যুর পর একজন মুনি সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞার্থ দীক্ষার আয়োজন করিলেন। দীক্ষার পূর্ব্বে ছয় দিবস মৌনী হইয়া সংযম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। সুবাহু এবং মারীচ অনুচরগণের সহিত ষষ্ঠ-দিবসে যজ্ঞবেদী অপবিত্র করিবার জন্য রুধির দ্বারা বর্ষণ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র শীতেষু নামক মনু-দত্ত অস্ত্র দ্বারা মারীচকে অচেতন করিয়া যুদ্ধে নিরস্ত করিলেন; আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা সুবাহুর বক্ষ বিদ্ধ করিলেন; বায়ব্য অস্ত্রদ্বারা অপরাপর পাপানুষ্ঠানকারী রুধিরপায়ী দুরাচারী যজ্ঞ বিনাশকারী নির্দ্দয় রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন। এখানে বাল্মীকি রাক্ষসদের কোন রূপ বর্ণনা করেন নাই; চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

অরণ্যকাণ্ডের প্রথমেই রামচন্দ্রের সহিত একজন রাক্ষসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই রাক্ষস ছিল মহাশব্দকারী ; তাহার দেহ ছিল পর্ব্বতশৃঙ্গ তুল্য ; তাহার চক্ষুদ্বয় গভীর, অতি বৃহৎ, বদনমণ্ডল বীভৎস, বিকট উদর, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষম, দীর্ঘ ও বিকৃত। সেই বীভৎস রাক্ষস রুধিরাদ্র ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন।

বিরাধ রাক্ষসের রূপ

গভীরাক্ষং মহাবক্ত্রং বিকটং বিকটোদরম্।
বীভৎসং বিষমং দীর্ঘং বিকৃতং ঘোরদর্শনম্॥
বসানং চর্ম্ম বৈয়াঘ্রং বসাদ্র্ং রুধিরোক্ষিতম্। ৩।২।৫-৬

এই রাক্ষস তিনটি সিংহ, চারিটি ব্যাঘ্র, দুইটি বৃক, দশটি পৃষত-মৃগ, দন্তযুক্ত বৃহৎ হস্তিমুণ্ড লৌহশূলে নিবদ্ধ করিয়া চিৎকার করিতেছিল।

ত্রীন্ সিংহাংশ্চতুরো ব্যাঘ্রান্ দ্বৌ বৃকৌ পৃষতান্ দশ।
সবিষাণং বসাদিগ্ধং গজস্য চ শিরোমহৎ।
অবসজ্যায়সে শূলে বিনদন্তং মহাস্বনম্॥ ৩।২।৭

রাক্ষসপুঙ্গব আত্ম পরিচয় দিলেন--আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ, আমি ঋষি মাংস ভক্ষণ করিয়া সশস্ত্র নিবিড় বনে বিচরণ করি।

অহং বনমিদং দুর্গং বিরাধো নাম রাক্ষসঃ।
চরামি সায়ুধো নিত্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্। ৩।২।১২

প্রথমে বিরাধ ছিলেন একজন গন্ধর্ব্ব, তাঁহার গন্ধর্ব্ব নাম ছিল তুম্বুরু, তিনি কুবেরের শাপে ভীতিপ্রদ রাক্ষস দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিরাধকে মৃত্তিকা গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া নিধন করিয়াছিলেন।

বিরাধ বধের পর রামচন্দ্র শরভঙ্গ মুনির আশ্রম অভিমুখে গমন করিলেন। দণ্ডকারণ্যে বহু মুনি ঋষি বাস করিতেন। রামচন্দ্র পত্নী ও ভ্রাতার সহিত প্রত্যেক মুনির আশ্রমে সাময়িক আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

তত্র সংবসতস্তস্য মুনীনামাশ্রমেষু বৈ।
রমতশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ। ৩।১১।২৬

তারপর রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যবাসী অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অগস্ত্য ঋষি হইলেও যুদ্ধ ত্যাগ করেন নাই। তিনি যমতুল্য অসুরদিগকে বলপূর্ব্বক নিগ্রহ করিয়া দণ্ডকারণ্যের একাংশ নিঃশঙ্ক করিয়াছিলেন। ইল্বল ও বাতাপি নামক ব্রাহ্মণঘাতী অসুরদ্বয়কে অগস্ত্য ঋষি বধ করিয়াছিলেন। অগস্ত্যের ভয়ে তাঁহার আশ্রমে দেবতা, যক্ষ, নাগ ও পক্ষিগণ নিয়তাহার হইয়া বাস করিত।

অত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অগস্ত্যং নিয়তাহারাঃ সততং পর্য্যুপাসতে॥ ৩।১১।৮৯

রামচন্দ্র অগস্ত্যের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। ঋষি অগস্ত্যের পরামর্শ অনুসারে গোদাবরী নদীর সন্নিকটে পঞ্চবটী নামক স্থানে দণ্ডকারণ্যের মধ্যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সভ্রাতা ও সপত্নী বাস করিতে লাগিলেন।

একদা পঞ্চবটী আশ্রমে এক রাক্ষসীর আবির্ভাব হইল। সেই রাক্ষসী ছিলেন লঙ্কাধিপতি দশানন রাবণের ভগিনী, তাঁহার নাম শূর্পণখা।

শূর্পণখার বর্ণনা

সেই রাক্ষসী ছিলেন কটুভাষিনী দুর্ম্মুখী; রাক্ষসীর উদর ছিল বৃহৎ, সুতরাং তিনি মহোদরী; তাঁহার অক্ষি ছিল দীপ্তিহীন, সুতরাং বিরূপাক্ষী; তাঁহার কেশ ছিল তাম্রবর্ণ, সুতরাং তাম্রকেশী; তাঁহার রূপ বিকৃত, সুতরাং বিকৃতরূপা; কণ্ঠস্বর ছিল ভয়ঙ্কর, সুতরাং ঘোরস্বরা; বয়স ছিল অত্যন্ত অধিক, সুতরাং অতিবৃদ্ধা; বিপরীত কথা বলিতেন, সুতরাং প্রতিকূলবাদিনী; অত্যন্ত দুর্ব্বিনীতা ছিলেন, সুতরাং অতি দুর্ব্বৃত্তা। তাঁহার রূপ ছিল অপ্রিয় দর্শনা, অর্থাৎ যত প্রকার কুৎসিত বিকৃত রূপ হইতে পারে, বাল্মীকি মুনি সেইরূপ বিশেষণ দ্বারা

শূর্পণখাকে বিশেষিত করিয়াছেন। এখানে বাল্মীকি পক্ষপাত দোষদুষ্ট। বাল্মীকির ভাষায়ঃ—

সুমুখং দুর্ম্মুখী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী ॥
বিশালাক্ষং বিরূপাক্ষী সুকেশং তাম্রমূর্দ্ধজা।
প্রিয়রূপং বিরূপা সা সুস্বরং ভৈরবস্বনা ॥
তরুণং দারুণা বৃদ্ধা দক্ষিণং বামভাষিণী।
ন্যায়বৃত্তং সুদুর্বৃত্তা প্রিয়মপ্রিয়দর্শনা ॥
শরীরজসমাবিষ্টা রাক্ষসী রামমব্রবীৎ। ৩।১৭।৯-১২

শূর্পণখা রামের নিকট প্রেম নিবেদন করিয়া বিবাহ প্রস্তাব-করিলেন। সেই সময় রামের নিকট সীতার রূপ বর্ণনা করিয়া রামের মনে সীতার প্রতি বিরুদ্ধভাব জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চিরায় ভব ভর্ত্তা মে সীতয়া কিং করিষ্যসি ॥
বিকৃতা চ বিরূপা চ ন সেয়ং সদৃশী তব।
অহমেবানুরূপা তে ভার্য্যারূপেণ পশ্য মাম্ ॥ ৩।১৭।২৫-২৬

সীতাকে লইয়া তুমি কি করিবে? সীতা বিকৃতা, বিরূপা; তোমার রূপের উপযুক্ত নহে। আমিই তোমার উপযুক্তা ভার্য্যা—তুমি আমাকে ভার্য্যা রূপে দেখ।

নিজের রূপ সম্বন্ধে রাক্ষসী শূর্পণখা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। রামচন্দ্র রহস্য করিয়া শূর্পণখাকে বলিলেন, "আমি বিবাহিত সুতরাং তুমি আমার প্রিয় দর্শন ভ্রাতাকে ভজনা কর।" রামকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া কামাতুরা শূর্পণখা আত্ম-বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—"আমি নারীগণের মধ্যে উত্তমা, সুতরাং আমি তোমার রূপের অনুরূপ ভার্য্যা। তুমি আমার সহিত দণ্ডকারণ্যে সুখে বিহার করিবে। রাক্ষসী তখন কামমোহিতা।"

বিসৃজ্য রামং সহসা ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥
অস্য রূপস্য তে যুক্তা ভার্য্যাহং বরবর্ণিনী।
ময়া সহ সুখং সর্ব্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি ॥ ৩।১৮।৬-৭

লক্ষ্মণ কামাতুরা শূর্পণখাকে রহস্য করিয়া মিষ্টবাক্যে তুষ্ট

করিয়া পুনরায় রামের নিকট প্রেরণ করিলেন। সীতাকে রামের পার্শ্বে উপবিষ্টা দেখিয়া ঈর্ষাপরায়ণা শূর্পণখা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি এই কুরূপা অসতী করালী নতোদরী বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাকে সম্মান করিতেছ না কেন?"

এতাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
ভার্য্যাং বৃদ্ধাং পরিত্যজ্য ত্বামেবৈষ ভজিষ্যতি॥ ৩।১৮।১১

সুতরাং দেখা যায় রূপের বর্ণনার মধ্যে বক্তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট স্থান আছে। সীতাকে বিরূপা করালরূপা বৃদ্ধা অভিহিতা করার মধ্যে শূর্পণখার ঈর্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। নতোদরী আর্য্য সমাজে রূপের লক্ষণ, রাক্ষস সমাজে মহোদরী সুন্দরী। শূর্পণখা সীতার অবনত উদরকে কুরূপের লক্ষণ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

অথচ অকম্পন যখন রাবণের নিকট খরদূষণ, মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী, ত্রিশিরা প্রভৃতি মহাবীর রাক্ষসগণের নিধন সংবাদ নিবেদন করিয়া রাবণকে সীতাহরণের পরামর্শ দিলেন, তখন তিনি সীতাকে উত্তমা, শ্যামা, সুমধ্যমা, দেবকন্যা, মানবী, গন্ধর্ব্বী, অপ্সরা, নাগিনী অপেক্ষাও রূপবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ভার্য্যা তস্যোত্তমা লোকে সীতা নাম সুমধ্যমা।
শ্যামা সমবিভক্তাঙ্গী স্ত্রীরত্নং রত্নভূষিতা॥
নৈব দেবী ন গন্ধর্ব্বী নাপ্সরা ন চ পন্নগী।
তুল্যা সীমন্তিনী তস্যা মানুষী তু কুতো ভবেৎ। ৩।৩১।২৯-৩০

অন্যত্র শূর্পণখা রাক্ষসরাজ রাবণকে সীতাহরণের জন্য প্ররোচিত করিবার সময় সীতার রূপ বর্ণনা করিয়া বিপরীত কথা বলিয়াছিলেন; সীতার বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, লোচনদ্বয় বিশাল, বর্ণজ্যোতি কাঞ্চনবৎ, কটি ক্ষীণ, নখ উন্নত অথচ রক্তবর্ণ, সীতার কেশ, নাসিকা ও উরু অতি মনোরম; গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর বা মনুষ্যলোকে তাঁহার ন্যায় সুন্দরী ললনা আমি দেখি

রাক্ষসের রূপাদর্শ

নাই। পৃথিবীতে অনুপম লাবণ্যময়ী, শ্লাঘ্যদেহা, বিস্তৃত জঘনা, প্রশস্ত বদনা, পীনোন্নত পয়োধরা, সেই সুশীলা সীতা আপনারই ভার্য্যা হওয়ার উপযুক্তা, রাবণই সীতার উপযুক্ত স্বামী।

সা সুশীলা বপুঃশ্লাঘ্যা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
তবানুরূপা ভার্য্যা সা ত্বঞ্চ তস্যাঃ পতির্বরঃ॥
তাস্তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
ভার্য্যার্থে তু তবানেতুমুদ্যতাহং বরাননাম্॥ ৩।৩৪।২০-২১

সুতরাং দেখা যায় যে রূপের বর্ণনা স্থান কাল ও পাত্র ভেদে পৃথক হওয়া স্বাভাবিক, শূর্পণখা সীতার রূপের বর্ণনা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বশেষে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে আদর্শ বিচারে সীতার রূপই রাক্ষসের দৃষ্টিতে শ্লাঘনীয় ছিল।

রাবণের রূপের প্রথম উল্লেখ রহিয়াছে অরণ্যকাণ্ডে। শূর্পণখা নাসাকর্ণ বিচ্যুতা হইয়া লঙ্কায় রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাবণ তখন অমাত্যগণসহ সপ্তভূমিক গৃহে রমনীয় আসনে সমাসীন। রাবণ ছিলেন সকল রাজলক্ষণযুক্ত দশগ্রীব, বৃহৎ বদন, বিংশতি হস্ত, বিশাল বক্ষ, শুভ্র দন্ত, স্নিগ্ধ বৈদুর্য্যমনিতুল্য বর্ণ—পর্ব্বত প্রমাণ দেহ।

উত্তরকাণ্ডে রাবণের জন্মবৃত্তান্তের মধ্যেও এই প্রকার রূপ বর্ণনা উল্লেখ আছে।

রাবণ মানব ঋষি বিশ্রবা মুনির ঔরসে সুমালী রক্ষ কন্যা কৈকসীর গর্ভজাত সন্তান। সুতরাং দেখা যায় রক্ষ ও মানবের শারীরিক গঠন বিপরীত ছিল না। রাবণের চরিত্র বিশ্রবা মুনির অভিশাপের ফলে রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়াছিল। প্রকৃতির নিয়ম

রাবণের রূপ

অনুসারে পিতা ও মাতার আকৃতির সন্ধান প্রায়শঃ সন্তানের মধ্যে লক্ষণীয়। রাবণের পিতা ছিলেন মানব, সুতরাং তাঁহার আকৃতি মানবোচিত। মাতা

রক্ষকন্যা, বাল্মীকির বর্ণনা অনুসারে যথাকালে সুমালী রক্ষকন্যা কৈকসী বিভৎস "রক্ষরূপ সুদারুণ" সন্তান প্রসব করিলেন। সেই সন্তানের ছিল দশগ্রীব, বিশাল দন্ত, মেঘনীলবর্ণ দেহকান্তি, তাম্রবর্ণ ওষ্ঠ, বিংশতি হস্ত, বিরাট মুখমণ্ডল এবং জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তুল্য কেশ।

সা কন্যা (কৈকসী) রাম কালেন কেনচিৎ।
জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সুদারুণম্॥
দশগ্রীবং মহাদংষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
তাম্রোষ্ঠং বিংশতিভুজং মহাস্যং দীপ্তমূর্দ্ধজম্॥ ৭।৯।২৮-২৯

সুন্দরকাণ্ডে জানকীর অন্বেষণে হনুমান লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন। নানা বিপর্য্যয় ও দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া রাবণের শয়নাগারে উপস্থিত হইয়া রাবণকে পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত দেখিলেন। তাঁহার মেঘের ন্যায় অঞ্জন বর্ণ, প্রদীপ্ত কুণ্ডল শোভিত কর্ণদ্বয়; নেত্রযুগল রক্তবর্ণ, বিশাল বাহু, দেহ সুবর্ণময় বস্ত্র পরিহিত—

তস্মিন্ জীমূতসঙ্কাশং প্রদীপ্তোজ্জ্বলকুণ্ডলম্।
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মহারজতবাসসম্॥ ৫।১০।৭

বন্দী হইয়া হনুমান রাজসভায় নীত হইলেন। সেখানে হনুমানের সহিত রাবণের প্রথম সাক্ষাৎ। হনুমান দেখিলেন—রাবণের বিচিত্র রূপ—রক্তবর্ণ চক্ষু, ভীমদর্শন, তীক্ষ্ণ দন্ত, লম্বমান ওষ্ঠ, দশানন, নীলাঞ্জন তুল্য দেহকান্তি, পূর্ণচন্দ্রনিভ মুখমণ্ডল, নবোদিত সূর্য্যের কিরণদ্বারা উদ্ভাসিত মেঘের ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্য।

বিচিত্রং দর্শনীয়ৈশ্চ রক্তাক্ষৈর্ভীমদর্শনৈঃ।
দীপ্ততীক্ষ্ণমহাদংষ্ট্রং প্রলম্বং দশনচ্ছদৈঃ॥
শিরোভির্দশভির্বীরং ভ্রাজমানং মহৌজসম্।
নানাব্যালসমাকীর্ণৈঃ শিখরৈরিব মন্দরম্॥
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং হারেণোরসি রাজতা।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রেণ সবালার্কমিবাম্বুদম্॥ ৫।৪৯।৫-৭

হনুমান রাবণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; অহো রাক্ষসরাজের কি রূপ, কি ধৈর্য্য, কি পরাক্রম, কি দেহ কান্তি, রাক্ষসরাজ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত। যদি রাবণের অধর্ম্ম এত বলবান না হইত, তবে রাবণ সুরলোক ও সুরপতি ইন্দ্রের রক্ষক হইতেন। হনুমান বিমুগ্ধ।

মনসা চিন্তয়ামাস তেজসা তস্য মোহিতঃ ॥
অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্ব্বলক্ষণযুক্ততা ॥
যদ্যধর্ম্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা। ৫।৪৯।১৬-১৮

রামচন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিভীষণ রাবণের পরিচয় দিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, "অপূর্ব্ব দীপ্ত-তেজা রাক্ষসরাজ রাবণ কি তেজস্বী, তাঁহার দেহের কিরণ ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত, ভাস্করকিরণের ন্যায় তেজসমাকীর্ণ রূপ দর্শন করা যায় না। রাক্ষসপতির দেহ দেবতা ও দানববীরের ন্যায় শোভা পাইতেছে।"

অহো দীপ্তমহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যো রশ্মিভির্ভাতি রাবণঃ।
ন ব্যক্তং লক্ষয়ে হ্যস্য রূপং তেজঃসমাবৃতম্ ॥
দেবদানববীরাণাং বপুরেবংবিধং ভবেৎ। ৬।৫৯।২৬-২৮

তাড়কা, বিরাধ, কবন্ধ প্রভৃতি রাক্ষস রাক্ষসীর রূপ বর্ণনার ভিতরে লক্ষণীয় বিষয় এই যে তাড়কা ছিলেন শাপভ্রষ্টা যক্ষিনী। তিনি অগস্ত্য ঋষির অভিশাপের ফলে বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া-ছিলেন। তুম্বুরু ছিলেন যক্ষ, যক্ষরাজ কুবেরের অভিশাপে রাক্ষস রূপ লাভ করিয়াছিলেন এবং বিরাধ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কবন্ধ ছিলেন দানব ; মহর্ষি স্থূলশিরার অভিশাপে রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্রবা মুনি যজ্ঞে আহুতি প্রদান কালে কৈকসীর উপস্থিতিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অভিশাপ দিলেন—"তুমি নিদারুণ

ক্রূর প্রকৃতি, বিকট রূপ, বিকৃত স্বভাব সন্তানের জননী হইবে।” এই অভিশাপের ফলেই কৈকসী রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ এবং শূর্পণখা নাম্নী অদ্ভুত দর্শন পুত্রকন্যা লাভ করেন।

বাল্মীকি অন্যান্য রাক্ষসদের বর্ণনায় অধিকাংশ স্থলেই বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার অধিকতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি রাক্ষসের আকৃতি কল্পনা করিয়াছেন। রূপ বর্ণনায় কল্পনার স্থান রামায়ণে অতি প্রশস্ত।

এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে রামায়ণে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে এবং বিভিন্ন যুগে রামায়ণ রচিত হইয়াছে; ইহা নিশ্চয় যে আদি এবং উত্তরকাণ্ড প্রায় সর্ব্বাংশ প্রক্ষিপ্ত, এবং এই উত্তরকাণ্ডেই রাক্ষসদের বর্ণনা অধিক সন্নিবেশিত। পরবর্ত্তী কালে বাল্মীকির শিষ্যগণ লোক বন্ধনের নিমিত্ত বহুস্থানে অদ্ভুত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কবি কালিদাস রাবণের দশমুণ্ড এবং বিংশতি হস্তের উল্লেখ করেন নাই।

রাক্ষসকে বহুস্থানে মানব ও দেবতা অপেক্ষা উন্নততর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এই সমস্ত ঋষি, মুনি কবির দৃষ্টিতে রাক্ষস মানুষ ছিলেন এবং তাঁহাদের রূপ বর্ণনা ও মানুষের অনুরূপ হইয়াছে।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে ক্রৌঞ্চ নামক নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন, সেখানে বিজন পর্ব্বতের পাদদেশে পাতালতুল্য গভীর চির অন্ধকারময় গহ্বরের সন্ধান পাইলেন। সেখানে তাঁহারা দেখিলেন এক লম্বোদরী, তীক্ষ্ণদন্তা করালী, ভীমরূপা, বিকটরূপিনী, কঠিন চর্ম্মধারিণী, মুক্তকেশী, মৃগভক্ষণরতা রাক্ষসী।

দদর্শতুর্মহারূপাং রাক্ষসীং বিকৃতাননাম্॥
ভয়দামল্পসত্ত্বানাং বীভৎসাং রৌদ্রদর্শনাম্।
লম্বোদরীং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাং করালীং পরুষত্বচম্॥
ভক্ষয়ন্তীং মৃগান্ ভীমাং বিকটাং মুক্তমূর্দ্ধজাম্। ৩.৬৯।১১-১৩

সে ছিল অয়োমুখী রাক্ষসী। অয়োমুখী শূর্পণখার ন্যায় লক্ষ্মণের নিকট কাম নিবেদন করিল। লক্ষ্মণ অয়োমুখীরও কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া দিলেন। রাক্ষসী যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেখানে অন্তর্হিতা হইল। অয়োমুখীর আর কোন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

অয়োমুখী রাক্ষসী

রাম লক্ষ্মণ অল্পক্ষণ পরেই রাক্ষস কবন্ধের দর্শন পাইলেন। বিপুল বক্ষ, বিপুলকায়, সুতীক্ষ্ণাগ্র রোম সমূহে আচ্ছাদিত, নীল মেঘসদৃশবর্ণ, ভয়ঙ্কর মেঘতুল্য গর্জ্জনকারী, গ্রীবা ও মস্তকবিহীন।

দদর্শ সুমহাকায়ং রাক্ষসং বিপুলোরসম্।
আসেদতুশ্চ তদ্রক্ষস্তাবুভৌ প্রমুখে স্থিতম্।
বিবৃদ্ধমশিরোগ্রীবং কবন্ধমুদরেমুখম্॥
রোমভির্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাগিরিমিবোচ্ছ্রিতম্।
নীলমেঘনিভং রৌদ্রং মেঘস্তনিতনিস্বনম্॥ ৩।৬৯।২৬-২৮

কবন্ধের ললাটে একটি মাত্র চক্ষু অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছিল; সেই চক্ষুর পক্ষ্মগুলি অতি বৃহৎ। ঐ রাক্ষস সেই বিশাল চক্ষুর সাহায্যে দূরবর্ত্তী পদার্থ সম্যকরূপে দেখিতে পাইত।

অগ্নিজ্বালানিকাশেন ললাটস্থেন দীপ্যতা।
মহাপক্ষ্মেণ পিঙ্গেন বিপুলেনায়তেন চ॥
একেনোরসি ঘোরেণ নয়নেন সুদর্শিনা।
মহাদংষ্ট্রোপপন্নং তং লোলিহানং মহামুখম্। ৩।৬৯।২৯-৩০

কবন্ধ তাহার বিশাল সুবিশাল হস্তদ্বয় সঞ্চালন করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহ, ভল্লুক, হরিণ ও পক্ষী ধরিয়া ভক্ষণ করিতেছিল, রাম লক্ষ্মণও তাহার প্রসারিত হস্তের আকর্ষণ হইতে রক্ষা পাইলেন না। রাম কৌশলে কবন্ধের দক্ষিণ বাহু এবং লক্ষ্মণ বাম বাহু ছেদন করিলেন। কবন্ধ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে?" আত্মপরিচয় দিয়া রাম কহিলেন—"তুমি কে? তোমার সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল বক্ষঃস্থলে কিরূপে আসিল?

কবন্ধের বর্ণনা

তোমার জঙ্ঘা ভগ্ন কেন? তুমি কেন কবন্ধ হইয়াছ?” কবন্ধ উত্তর করিল, “আমি ভাগ্যক্রমে আপনাদের দর্শন পাইলাম, আমার ভাগ্যানুসারে আপনারা আমার বাহু ছেদন করিয়াছেন, আমি আপনাদের পরিচয় জানিতে পারিতেছি।”

তারপর কবন্ধ আত্মপরিচয় দিয়া কহিল, “আমি দনুর পুত্র; পূর্ব্বে আমি মহাবিক্রমশালী ছিলাম, আমার কমনীয় রূপ সূর্য্য চন্দ্রের তুল্য ছিল। কিন্তু আমি ভয়ঙ্কর বিকট রূপ ধারণ করিয়া বনবাসী ঋষিদিগের ভয় উৎপাদন করিতাম। একদিন আমি এই প্রকার ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া স্থূলশিরা নামক মহর্ষিকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন যে তোমার এই প্রকার লোকভীতিকর রূপই চিরন্তন হউক। আমি মহর্ষি স্থূলশিরাকে তুষ্ট করিবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, অভিশাপ মুক্তির জন্য অনুরোধ করিলাম। মহর্ষি আমাকে বলিলেন, অযোধ্যার রাজকুমার রামচন্দ্র যখন তোমার বাহু ছেদন করিয়া বন মধ্যে তোমার সৎকার করিবেন, তখন তুমি অভিশাপ মুক্ত হইবে; তোমার মনোহর রূপ পুনরায় লাভ করিবে। অতএব আপনি যখন আমার বাহু ছেদন করিয়াছেন, তখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনি অযোধ্যার রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র। আপনি আমাকে অগ্নিতে দাহ করুন, তাহা হইলে আমি আমার পূর্ব্ব দেহ লাভ করিব। শ্রীরামচন্দ্র কবন্ধের চিতা প্রস্তুত করিয়া কবন্ধকে দাহ করিলেন। এই কবন্ধই শ্রীরামচন্দ্রকে সীতা উদ্ধার করিবার জন্য কিষ্কিন্ধ্যার রাজকুমার সুগ্রীবের সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন।

রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণে কিষ্কিন্ধা অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছেন, বালী বধ করিয়াছেন। সুগ্রীবের ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধুলাভ করিলেন। হনুমানের ন্যায় বীর ভক্ত লাভ করিলেন। সুগ্রীব সীতা অন্বেষণের জন্য বানরদিগকে আহ্বান করিলেন। বানর যূথপতিগণ সমবেত

হইলে সুগ্রীব সীতার সম্ভাব্য উপস্থিতির স্থান অনুসন্ধানের উপদেশ দিলেন। বানর যূথপতি বিনতাকে ভারতের নানাস্থানের ও নানাজাতীয় প্রাণীর উল্লেখ করিলেন। তাহাদের মধ্যে এক জাতীয় প্রাণী ছিল—কর্ণ অতিশয় বিস্তৃত ও ওষ্ঠ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, মুখ লৌহের ন্যায় কঠিন, যাহারা এক পদে দ্রুত চলিতে পারে, যাহাদিগের সন্তান অসংখ্য, যাহারা মহাবলশালী, যাহারা নর মাংসভোজী রাক্ষস। যাহাদিগের কেশ কলাপ অতিশয় সূক্ষ্ম, যাহারা কাঞ্চন কান্তি এবং সুন্দর সুদর্শন, যাহারা মাংসভোজী, জলমধ্যে বিচরণকারী এবং বিকট দর্শন, যাহাদিগের নিম্নভাগ দানবের ন্যায় ও উর্দ্ধভাগ ব্যাঘ্রাকার—যাহারা নরব্যাঘ্র বলিয়া পরিচিত।

নানাজাতীয় প্রাণী

কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব তথা চাপ্যোষ্ঠকর্ণকাঃ।
ঘোরলোহমুখাশ্চৈব জবনাশ্চৈকপাদকাঃ॥
অক্ষয়া বালবন্তশ্চ তথৈব পুরুষাদকাঃ।
করাতাস্তীক্ষ্ণচূড়াশ্চ হেমাভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ॥
আমমীনাশনাশ্চাপি কিরাতা দ্বীপবাসিনঃ।
অন্তর্জলচরা ঘোরা নরব্যাঘ্রা ইতি শ্রুতাঃ॥ ৪।৪০।২৬-২৮

হনুমান সমুদ্র অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া অপ্রত্যাশিত দৃশ্য অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিলেন রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ এক চক্ষু, কেহ এক কর্ণ, কেহ এক স্তনা, বক্র মুখ, বিষম অঙ্গ, কেহ ভয়ঙ্কর রূপা, কেহ অতি প্রচ্ছন্ন কেশ, তাহাদের মধ্যে কেহ অতি স্থূল, কেহ অতি কৃশ, কেহ অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব, কেহ অত্যন্ত গৌরবর্ণ অথবা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। কুব্জ বা বামন ছিল …………কেহ ছিল বিকৃতকায়, কেহ লাবণ্যময়।

অদ্ভুতদর্শন রাক্ষস

একাক্ষানেককর্ণাংশ্চ চলদেকপয়োধরান্॥
করালান্ ভুগ্নবক্ত্রাংশ্চ বিকটান্ বামনাংস্তথা।
নাতিস্থূলান্ নাতিকৃশান্ নাতিদীর্ঘাতিহ্রস্বকান্॥

নাতিগৌরান্ নাতিকৃষ্ণান্ নাতি কুব্জান্ ন বামনান্।
বিরূপান্ বহুরূপাংশ্চ স্বরূপাংশ্চ স্ববর্চ্চসঃ॥ ৫।৪।১৬-১৯

হনুমান রাবণের শয্যাগৃহে অবস্থিতা নারীদিগকে আকাশচ্যুত নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করিলেন—

তারাণামিব স্বব্যক্তং মহতীনাং শুভার্চ্চিষাম্।
প্রভাবর্ণপ্রসাদাশ্চ বিরেজুস্তত্র যোষিতাম্॥ ৫।৯।৪৩

হনুমান রাবণের বিহার গৃহে দেখিলেন—অতি অপরূপ রমণী কেহ রাজদুহিতা, কেহ ব্রাহ্মণতনয়া, কেহ দৈত্য, কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ রাক্ষস কন্যা—

জ্বলন্তঃ কাঞ্চনা দ্বীপাঃ প্রেক্ষন্তোঽনিমিষা ইব॥
রাজর্ষিবিপ্রদৈত্যানাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
রক্ষসাঞ্চাভবন্ কন্যাস্তস্য কামবশং গতাঃ॥ ৫।৯।৬৭-৬৮

সুতরাং দেখা যায় রাবণের গৃহে অপূর্ব্ব সুন্দরী রাক্ষসকন্যা ছিল। এবং রাক্ষসদের মধ্যে রূপলাবণ্যময়ী সুন্দরীরও সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কনকবর্ণতুল্যা গৌরবর্ণা মনোহর রূপশালিনী মন্দোদরীও ছিলেন—

গৌরীং কনকবর্ণাভামিষ্টামন্তঃপুরেশ্বরীম্।
কপির্মন্দোদরীং তত্র শয়ানাং চারুরূপিণীম্॥ ৫।১০।৫২

সেই গৃহে শ্যামা, কৃষ্ণা, এবং কাঞ্চনবর্ণা বহু সুন্দরী রাক্ষসরমণীও ছিলেন—

শ্যামাবদাতাস্তত্রান্যাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণা বরাঙ্গনাঃ।
কাশ্চিৎ কাঞ্চনবর্ণাঢ্যাঃ প্রমদা রাক্ষসালয়ে'। ৫।১১।৩৫

হনুমান রাক্ষসরাজ্যের অন্তঃপুর সম্যক অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে অশোকবনে রামপ্রিয়া সীতার দর্শন লাভ করিলেন। হনুমান দেখিলেন সীতাদেবীর অনতিদূরে বিকটমূর্ত্তি রাক্ষসিগণ উপবিষ্ট রহিয়াছে—

স দদর্শ বিদূরস্থা রাক্ষসীর্ঘোরদর্শনাঃ॥

একাক্ষীমেককর্ণাঞ্চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা।
অকর্ণাং শঙ্কুকর্ণাঞ্চ মস্তকোচ্ছ্বাসনাসিকাম্‌॥ ৫।১৭।৪-৫

বিভীষণের রূপ :—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গে প্রথম বিভীষণের রূপের সামান্য বর্ণনা পাওয়া যায়—বিভীষণ রাবণ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া চারিজন অনুচরসহ রামচন্দ্রের শিবিরে উপস্থিত হইলেন—বানর যূথপতিগণ ভূতল হইতে সেই আকাশস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত দেহ মেরুশৃঙ্গ তুল্য বিভীষণকে দেখিতে পাইল।

তং মেরুশিখরাকারং দীপ্তামিব শতহ্রদাম্‌।
গগনস্থং মহীস্থাস্তে দদৃশুর্বানরাধিপাঃ॥ ৬।১৭।২

কুম্ভকর্ণের রূপ :—বাল্মীকি কুম্ভকর্ণের একটা নাটকীয় বর্ণনা লঙ্কাকাণ্ডে লিখিয়াছেন। রাম রাবণের যুদ্ধ অত্যন্ত জটিল পর্য্যায় আসিয়াছে, রাবণের নূতনভাবে যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজন, শ্রেষ্ঠ সেনাপতি নিযুক্ত করিতে হইবে। কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার বরে বৎসরে ছয়মাস জাগ্রত ও ছয়মাস নিদ্রিত থাকেন। এই সময় তাঁহার নিদ্রার কাল, রাবণের আদেশে নিশাচরগণ যোজন বিস্তৃত গন্ধপুষ্প প্রবাহিনী রমনীয় রত্নকাঞ্চন শোভিত শয়নগৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে গন্ধমাল্য, প্রচুর ভক্ষ দ্রব্য এবং বহু বারুণীপূর্ণ কলসী। কুম্ভকর্ণ নিদ্রামগ্ন—তাঁহার ভূমি সংলগ্ন দেহ পর্ব্বত প্রমাণ, বিকৃত দর্শন, তাঁহার রোমরাজি উৎক্ষিপ্ত, নাসিকা হইতে বিষধর সর্পবৎ নিঃশ্বাস নির্গত হইতেছে। তাঁহার নাসাপুট ভয়ঙ্কর এবং বদন পাতাল সদৃশ বিপুল। কুম্ভকর্ণের ন্যায় রাক্ষসদিগের মধ্যে দীর্ঘকায় রাক্ষস আর কেহ ছিল না।

কুম্ভকর্ণের রূপ

দদৃশুর্নৈঋতব্যাঘ্রাঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্‌॥
তে তু তৎ বিকৃতং সুপ্তং বিকীর্ণমিব পর্ব্বতম্‌।
কুম্ভকর্ণং মহানিদ্রং সমেতাঃ প্রত্যবোধয়ন্‌॥
ঊর্দ্ধলোমাঞ্চিততনুং শ্বসন্তমিব পন্নগম্‌।
ভ্রাময়ন্তং বিনিশ্বাসৈঃ শয়ানং ভীমবিক্রমম্‌॥
ভীমনাসাপুটং তং তু পাতালবিপুলাননম্‌। ৬।৬০।২৬-২৯

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য যে বিরাট আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে কুম্ভকর্ণের দেহের পরিমাপ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। নিদ্রাভঙ্গে ক্ষুধিত কুম্ভকর্ণের জন্য খাদ্যের আয়োজন করা হইয়াছিল। তৃপ্তিকর বহু মৃগ, মহিষ, বরাহমাংস, মেরুসদৃশ অন্নরাশি, শোণিত পূর্ণ কলস এবং দুই সহস্র মদ্যপূর্ণ পাত্র। অবশ্য রামায়ণে বহু অত্যুক্তি আছে—যথা, কুম্ভকর্ণের যোজনব্যাপী দেহ, কবন্ধের যোজন-ব্যাপী হস্ত, হনুমানের পর্ব্বত শৃঙ্গ উত্তোলন, রাবণের কোটি কোটি সৈন্য, আরও কত কি। পাঠককে বুদ্ধি দ্বারা, সহজ জ্ঞান দ্বারা এই সমস্ত অতিশয়োক্তিকে বিচার করিয়া লইতে হইবে। কুম্ভকর্ণ ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই বহুসহস্র প্রজা ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

বালেন জাতমাত্রেণ ক্ষুধার্ত্তেন মহাত্মনা।
ভক্ষিতানি সহস্রাণি প্রজানাং সুবহূন্যপি ॥ ৬।৬১।১৩

কুম্ভকর্ণের বলবীর্য্য সম্পর্কে বিভীষণ বলিয়াছেন, ইন্দ্র একটি সুতীক্ষ্ণ বজ্র নিক্ষেপ করায় কুম্ভকর্ণ কিঞ্চিৎমাত্র আহত হইয়াছিলেন। কুম্ভকর্ণ তখন ঐরাবতের দন্ত উৎপাটন করিয়া ঐ দন্তদ্বারা মহেন্দ্রের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন, ইন্দ্র ইহাতে নিতান্ত পীড়িত ও রক্তাক্ত হইলেন।

ততঃ ক্রুদ্ধো মহেন্দ্রস্য কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
নিষ্কৃষ্যৈরাবতাদ্দন্তং জঘানোরসি বাসবম্ ॥
কুম্ভকর্ণপ্রহারার্ত্তো বিজজ্বাল স বাসবঃ। ৬।৬১।১৭-১৮

তাড়কা, বিরাধ, কবন্ধ প্রভৃতি রাক্ষসদের রূপ বর্ণনার ভিতরে লক্ষণীয় বিষয় এই যে তাড়কা ছিল শাপভ্রষ্টা যক্ষিণী। অগস্ত্য ঋষির শাপে বিকৃতরূপা হইয়াছিল। বিরাধও ছিল যক্ষ—কুবেরের শাপে রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং বিরাধ নামে পরিচিত হইয়াছিল। কবন্ধ ছিল দানব। মহর্ষি স্থূলশিরার অভিশাপে রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিশ্রবা কৈকসীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে তিনি নিদারুণ ক্রূরপ্রকৃতি, বিকটরূপ, বিকৃত-স্বভাব সন্তানের জননী হইবেন। সেই অভিশাপের ফলে

কৈকসী রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ নামক তিন পুত্র, শূর্পণখা নাম্নী কন্যা লাভ করিলেন। কুম্ভকর্ণের যোজনব্যাপী দেহ বিকৃত রূপ। শূর্পণখার রূপও তাঁহার নাম অনুযায়ী কল্পিত হইয়াছে।

রামায়ণে বর্ণিত অন্যান্য রাক্ষসদের রূপ বর্ণনায় বাল্মীকি বাস্তব অপেক্ষা কল্পনারই অধিকতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বাল্মীকির রাক্ষসদের চরিত্র ও প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে আকৃতি বর্ণনা সুসঙ্গত হয় নাই, কারণ জীবের প্রকৃতি বহুস্থলে আকৃতি অনুযায়ী হয়। কিন্তু বাল্মীকি কর্তৃক রাক্ষসের আকৃতি ও প্রকৃতি বর্ণনা বি-সম হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাবণের দিগ্বিজয়

রাক্ষসের জীবনের মূল আদর্শ ছিল শক্তি অর্জ্জন এবং দেহের পরিপূর্ণ সম্ভোগ। রাক্ষসরাষ্ট্রও এই আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হইত। বাস্তবিক পক্ষে রাবণের রাষ্ট্র ভোগাদর্শেরই প্রতিচ্ছবি। এই শক্তি অর্জ্জনের মূল উৎস ছিল দেবতার নিকট হইতে তপস্যালব্ধ বর। ব্রহ্মা ও মহাদেবের নিকট তপস্যা করিয়া রাবণের পূর্ব্বপুরুষগণ শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাক্ষস প্রধানগণ যাগযজ্ঞ করিয়া অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছিলেন এবং মহাশক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাক্ষসগণ স্বয়ং তপস্যা করিত; কিন্তু দেবতা, দানব অথবা মানবের মধ্যে কেহ তপস্যা করিয়া শক্তি অর্জ্জন করিবে—ইহা রাক্ষসগণ সহ্য করিতে পারিত না, সুতরাং নীতিগতভাবেই রাক্ষসগণ অন্যের তপস্যা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিত। রাক্ষস, দানব, অসুর, মানব ও দেবতাদের মধ্যে বিবাদের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল শক্তিপ্রতিযোগিতা, তপস্যা বিঘ্নের চেষ্টা এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষা। রামায়ণের আদিকাণ্ডে উল্লিখিত আছে যে মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথের নিকট অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়াছি, কিন্তু মারীচ ও সুবাহু নামক দুইজন রাক্ষস সেই যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে; যজ্ঞকালে আমার যজ্ঞবেদী রুধির প্লাবিত করিতেছে।"

রাক্ষসদের ভোগাদর্শ

ব্রতে তু বহুশশ্চীর্ণে সমাপ্ত্যাং রাক্ষসাবিমৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্য্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ।।
তৌ মাংসরুধিরৌঘেণ বেদিং তামভ্যবর্ষতাম্।
অবধূতে তথাভূতে তস্মিন্নিয়মনিশ্চয়ে। ১।১৯।৫-৬

রাবণ যুদ্ধ করিয়া রাজ্যলাভ করেন নাই। লঙ্কারাজ্য ছিল তাঁহার মাতামহ সুমালী রাক্ষসের সম্পত্তি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে

মহেশ্বরের বর লাভের পরে ময়দানবের নির্দ্দেশে মালী, মাল্যবান এবং সুমালী রাক্ষস স্বজন পরিবৃত হইয়া লঙ্কানগরীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। দেবতা ও ঋষিদিগের উপর অত্যাচার করার অপরাধে বিষ্ণু বহু রাক্ষসকে বধ করিলেন। সুমালী অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে সঙ্গে লইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পরে বিশ্রবা মুনি ঔরসে ভরদ্বাজ ঋষি কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভজাত সন্তান যক্ষ কুবের কিছুকাল লঙ্কা নগরী শাসন করেন। বিশ্রবা মুনির ঔরসে, সুমালী রক্ষ কন্যা কৈকসীর গর্ভজাত সন্তান রাবণ কর্ত্তৃক তপস্যালব্ধ শক্তি অর্জ্জনের সংবাদ শ্রবণে মাতামহ সুমালী উৎফুল্ল হইলেন। সুমালী রাবণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে লঙ্কা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাবণের মন্ত্রী বাক্যবিশারদ প্রহস্ত রাবণের পক্ষে কুবেরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মাতামহ-পরিত্যক্ত লঙ্কা নগরীর প্রভুত্ব যাচ্ঞা করিলেন। কুবের পিতা বিশ্রবা মুনির পরামর্শ অনুসারে লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন করিলেন। রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া শাসন আরম্ভ করিলেন।

রাবণের লঙ্কালাভ

বিবেশ নগরীং লঙ্কাং ভ্রাতৃভিঃ সবলানুগৈঃ॥

ধনদেন পরিত্যক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্। ৭।১১।৪৭-৪৮

স চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈস্তদা নিবেশয়ামাস পুরীং দশাননঃ। ৭।১১।৪৯

রাবণ ছিলেন শাপগ্রস্ত ক্রূর স্বভাব। লঙ্কা আগমনের অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার ক্রূর স্বভাব তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সহযোগে প্রকাশ হইতে লাগিল। রাবণ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ঋষিদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন, নন্দনবন বিনষ্ট করিলেন; যক্ষরাজ কুবের ততদিনে তপস্যা দ্বারা মহাদেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তিনি শিবসখা দেবতার সহচর,—ব্রহ্মার বরে তিনি চতুর্থ দিকপাল। রাবণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া স্বর্গের দেবতাগণ রাবণের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি এবং রাবণ বধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কুবের এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কনিষ্ঠ

ভ্রাতা রাবণকে সচেতন করিবার জন্য লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন। কুবেরের দূত যথেষ্ট অসংযত ভাষায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিনিধিরূপে রাজসভামধ্যে রাবণকে তিরস্কার করিলেন এবং কুবেরের শক্তির প্রশংসা ও রাবণের নিন্দা করিয়া রাক্ষসরাজের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করিলেন; রাবণ বধের জন্য দেবতাদের আয়োজনের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাবণ ক্রোধে রক্তচক্ষু হইলেন এবং দন্ত ও হস্ত নিপীড়নপূর্ব্বক বলিলেন —"কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি আমার গুরুজন; সুতরাং আমি স্থির করিয়াছিলাম, তাঁহাকে বধ করা আমার উচিত নহে। কিন্তু তাঁহার আত্মশ্লাঘা ও দেবতাগণের অভিপ্রায় আমাকে বিচলিত করিয়াছে। সুতরাং আমি স্থির করিলাম—বাহুবলে আমি ত্রিভুবন বিজয় করিব এবং চতুর্থ দিকপালকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দিকপালদিগকেও নিধন করিব।"

রাবণের দিগ্বিজয়ের সূচনা

> ন হন্তব্যো গুরুর্জ্যেষ্ঠো মমায়মিতি মন্যতে ॥
> তস্য ত্বিদানীং শ্রুত্বা মে বাক্যমেষা কৃতা মতিঃ।
> ত্রীন্ লোকানপি জেষ্যামি বাহুবীর্য্যমুপাশ্রিতঃ ॥
> এতন্মুহূর্ত্তমেবাহং তস্যৈকস্য তু বৈ কৃতে।
> চতুরো লোকপালাংস্তান্ নয়িষ্যামি যমক্ষয়ম্ ॥ ৭।১৩।৩৭-৩৯

লঙ্কাধিপতি রাবণ এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া খড়্গের আঘাতে কুবেরের দূতকে নিধন করিলেন। তারপরেই রাক্ষসরাজ রাবণ ত্রিভুবন জয়ের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেন। প্রথমেই তিনি সসৈন্যে কৈলাসে যক্ষরাজ পুরীতে উপস্থিত হইলেন। এই অভিযানে রাক্ষসরাজের সহচর ছিলেন মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি ছয়জন বিখ্যাত সেনাপতি। রাবণ সহজেই কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী জয় করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত পুষ্পকরথ অধিকার করিলেন।

অলকাপুরী জয়

অলকাপুরী বিজয়ের পর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাদেব অধ্যুষিত শরবনে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ভীষণ অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি

করিলেন। পাৰ্ব্বতী ভীতা ও চঞ্চলা হইয়া মহাদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। দেবাদিদেব শঙ্কর এই ভীতির কারণ অবগত হইয়া অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা শরবন কম্পিত করিলেন। রাবণ ও তাঁহার রাক্ষস অনুচরদিগের ভীষণ বাহুপীড়া উৎপাদন করিলেন। দশানন বাহুপীড়ায় কাতর হইয়া শঙ্করের সম্মুখে প্রণত হইলেন এবং সামবিহিত স্তোত্র উচ্চারণ করিয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। রাবণ সহস্র বৎসর বাহু পীড়ায় কাতর হইয়া নিদারুণ রবে রোদন করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তোমার নিদারুণ রবে ত্রিভুবন শব্দায়িত হইয়াছে, শঙ্কিত হইয়াছে। অতএব, তুমি রাবণ নামে * পরিচিত হইবে। তোমাকে আমি এই শরবণ ত্যাগের অনুমতি প্রদান করিলাম।"

শরবনে অভিযান

শৈলাক্রান্তেন যো মুক্তস্ত্বয়া রাবঃ সুদারুণঃ ॥
যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি ॥ ৭।১৬।৩৬-৩৭

মহাদেবের আদেশে রাবণ বর প্রার্থনা করিলে মহাদেব তাঁহাকে 'চন্দ্রহাস' নামক খড়্গ এবং শাপাদি দ্বারা অবিনাশী অবশিষ্ট আয়ু প্রদান করিলেন।

রাবণ পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবী পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যে তিনি উশীরবীজ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে নরনাথ মরুত্ত দেবতা পরিবৃত হইয়া মহেশ্বর-দৈবত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির ভ্রাতা ব্রহ্মর্ষি সংবর্ত্ত এই যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন। দেবগণ বরপ্রাপ্তি হেতু দুর্জ্জয় রাবণকে দর্শন করিয়া ভীত হইলেন, এবং ভয়ে তাঁহারা পশুপক্ষীরূপ ধারণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন। রাজা মরুত্ত পুরোহিত সংবর্ত্তের পরামর্শ অনুসারে রাবণের

নরনাথ মরুত্তের যজ্ঞ বিনাশ

* অন্যত্র উল্লেখ আছে যে জন্মের পরেই রাবণ ভীষণ রব করিয়া বিশ্বের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং ভীষণ রবের জন্যই তিনি রাবণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বিরুদ্ধে অস্ত্রত্যাগ করিলেন। রাবণ সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত মহর্ষিদিগকে নিধন করিয়াছিলেন এবং ঋষিমাংস ভক্ষণ ও রুধির পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন।

তান্ ভক্ষয়িত্বা তত্রস্থান্ মহর্ষীন্ যজ্ঞমাগতান্।
বিতৃপ্তো রুধিরৈস্তেষাং পুনঃ সম্প্রযযৌ মহীম্। ৭।১৮।১৯

রাক্ষস রাবণ মরুত্তকে জয় করিয়া দিগ্বিজয় কামনায় পৃথিবীপাল নরপতিগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরুরবা প্রভৃতি নরপতি রাবণের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু অযোধ্যাধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অনরণ্য রাবণের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু রাবণের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন।

যমের সহিত যুদ্ধ

পৃথিবা বিজয় সমাপ্ত করিয়া রাবণ নারদের পরামর্শে যমপুরীর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন, কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে লোকপালদিগকে জয় করিবেন। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যে তিনি অন্যতম লোকপাল মৃত্যুপতি যমের রাজধানী প্রেতরাজ-নগরের প্রতি যাত্রা করিলেন। প্রেতরাজ যমও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সপ্তদিবসব্যাপী যুদ্ধ হইল। পিতামহ ব্রহ্মা সাক্ষাৎ দর্শন দান করিয়া মৃত্যুপতি যমকে যুদ্ধে নিরস্ত করিলেন, কারণ, ব্রহ্মার বরে রাবণ অবধ্য হইয়াছিলেন। মৃত্যুপতি ব্রহ্মার আদেশ পালন করিয়া রাবণের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে যমরাজ রাবণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন এই ধারণায় রাক্ষসানুচরগণ রাবণকে অভিনন্দন করিল।

নিবাত কবচগণের সহিত যুদ্ধ ও মৈত্রী

তারপর রাবণ দৈত্য ও নাগগণ কর্তৃক অধ্যুষিত বরুণশাসিত সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিল। বাসুকি রক্ষিত ভোগবতী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় লব্ধবর নিবাতকবচ প্রভৃতি দৈত্য-গণ বাস করিতেছিল। দৈত্য রাক্ষসগণের মধ্যে সংবৎসর ব্যাপী যুদ্ধ হইল। অবশেষে পিতামহ ব্রহ্মার পরামর্শে রাবণ

নিবাতকবচদিগের সহিত অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিত্রতা করিলেন। এক বৎসরকাল রাবণ দৈত্যগৃহে বাস করিলেন। নিবাত কবচগণ রাক্ষসরাজ রাবণকে একশত মায়াবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল।

ততোঽগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং কৃতবাংস্তত্র রাবণঃ।
নিবাতকবচৈঃ সার্দ্ধং প্রীতিমানভবত্তদা ॥
তত্রোপধার্য্য মায়ানাং শতমেকং সমাপ্তবান্। ৭।২৩।১৪-১৬

অতঃপর রাবণ সমুদ্রপতি বরুণের পুরী অন্বেষণে অভিলাষী হইয়া পাতালে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কালকেয় দৈত্য গোষ্ঠী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত অশ্মনগরে উপস্থিত হইয়া রাবণ কালকেয়দিগকে নিধন কারলেন। ঘটনাচক্রে রাবণ তাঁহার ভগিনী শূর্পণখার স্বামী কালকেয় বংশীয় বীর বিদ্যুজ্জিহ্বকেও নিধন করিলেন।

কালকেয় দৈত্য-কুলের সহিত যুদ্ধ

অচিরকাল মধ্যে রাবণ বরুণালয়ে উপস্থিত হইলেন। বরুণ তখন অনুপস্থিত ছিলেন। বরুণের পুত্রগণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রাবণ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া আকাশ হইতে বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন। বরুণপুত্রগণের সহিত রাবণের তুমুল সংগ্রাম হইল। বরুণপুত্রগণ অত্যন্ত নিপীড়িত হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেন এবং রাক্ষসপতি স্বীয় বিজয় ঘোষণা করিলেন।

বরুণপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ

রাবণ বরুণালয় হইতে বহির্গত হইয়া সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্য দণ্ডী নামক দূতের মাধ্যমে বিনা যুদ্ধে রাক্ষসরাজ রাবণের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

গচ্ছ দণ্ডিন্ জয়স্বৈনং নির্জ্জিতোঽস্মীতি বা বদ ॥
যদ্বেঽভিকাঙ্ক্ষিতং কার্য্যঃ কঞ্চিৎ কালং ক্ষপাচরম্।
স গত্বা বচনাত্তস্য রাক্ষসস্য মহাত্মনঃ ॥
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং সূর্য্যোক্তবচনং তদা।
স শ্রুত্বা বচনং তস্য দণ্ডিনো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ঘোষয়িত্বা জগামাথ স্বজয়ং রাক্ষসাধিপঃ। ৭।২৫।১২-১৪

ইহার পর রাবণ যুবনাশ্বতনয় সপ্তদ্বীপবিজয়ী অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। দুইজনেই মহাবীর। দুইজনেই মহাদেবের বরলাভে অপরাজেয়। কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারেন নাই। রাবণের পূর্ব্বপুরুষ পুলস্ত্য ঋষি এবং মহর্ষি গালব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উভয়কে যুদ্ধে নিরস্ত করিলেন।

মান্ধাতা-রাবণ যুদ্ধ

পুলস্ত্যো গালবশ্চৈব বারয়ামাসতুর্নৃপম্ ॥
সোপালম্ভৈশ্চ বিবিধৈর্বাক্যৈ রাক্ষসসত্তমম্।
তৌ তু কৃত্বা তদা প্রীতিং নররাক্ষসয়োস্তদা।
সম্প্রস্থিতৌ সুসংহৃষ্টৌ পথা যেনৈব চাগতৌ ॥ ৭।২৬।৫৫-৫৬

যুদ্ধে শত্রু নিধন করিয়া, কোথাও বা পরাজিত করিয়া, কোথাও বা সন্ধি করিয়া অথবা মৈত্রীস্থাপন করিয়া রাবণ লঙ্কাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন হইলেন। পথে দেব, দানব, অসুর, রাক্ষস, নাগ, যক্ষ ও ঋষিকন্যা হরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানে দেখা যায় যে রাবণ সুন্দরা রাক্ষসকন্যাও অপহরণ করিয়াছেন অর্থাৎ রাক্ষসের মধ্যেও রাবণের প্রতিবাদী ছিল :

নিবর্ত্তমানঃ সংহৃষ্টো রাবণঃ স দুরাত্মবান্।
জহ্রে পথি নরেন্দ্রর্ষিদেবদানবকন্যকাঃ ॥
দর্শনীয়াং হি যাং রক্ষঃকন্যাং স্ত্রীং বাথ পশ্যতি।
হত্বা বন্ধুজনং তস্যা বিমানে তাং রুরোধ সঃ ॥ ৭।২৯।১-২

লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে মধুদৈত্য তাঁহার মাতৃস্বসা ভগিনী কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছেন। তখন রাবণপুত্র মেঘনাদ যজ্ঞে নিযুক্ত ছিলেন, কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত ছিলেন এবং বিভীষণ স্বয়ং তপস্যার জন্য জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাবণ মাতৃস্বসা ভগিনীর অপহরণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। অবিলম্বে তিনি সৈন্যসামন্ত সহ ভগিনীর অপহর্ত্তাকে

কুম্ভীনসীর বিবাহ

শাস্তি প্রদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কুম্ভীনসী ইতিপূর্ব্বেই মধুদৈত্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং কুম্ভীনসীর অনুরোধে রাবণ মধুর সহিত সখ্য-স্থাপন করিয়া এক রাত্রি মধুনগরে বাস করিলেন। মধুদৈত্য রাক্ষসরাজকে ধর্ম্মানুসারে এবং স্বোপাচারে অভ্যর্থনা ও পূজা করিলেন। মধুদৈত্য রাক্ষসরাজ রাবণের আত্মীয় পদবাচ্য হইলেন।

প্রাপ্য পূজাং দশগ্রীবো মধুবেশ্মনি বীর্য্যবান্।
তত্রৈ চৈকাং নিশামুষ্য গমনায়োপচক্রমে।৭।৩০।৫১

দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়

অতঃপর রাবণ কৈলাস অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। দেবতা ও রাক্ষসের মধ্যে লোকক্ষয়কারী ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দেবতাপক্ষে রুদ্র, বসু, আদিত্য ও মরুতগণ এবং রাক্ষসপক্ষে দৈত্য ও দানবগণ যোগদান করিয়াছিল। রাক্ষসসমাজের মাতামহ প্রসিদ্ধ বীর সুমালী নিহত হইলেন। পুলোমা দৈত্যের দৌহিত্র ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অকস্মাৎ যুদ্ধত্যাগ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। বোধ হয় জয়ন্ত এই যুদ্ধে দেবতার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন।

এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ পুলোমা নাম বীর্য্যবান্।
দৈত্যেন্দ্রস্তেন সংগৃহ্য শচীপুত্রোঽপবাহিতঃ ॥
সংগৃহ্য তং তু দৌহিত্রং প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা।
আর্য্যকঃ স হি তস্যাসীৎপুলোমা যেন সা শচী॥ ৭।৩৩।১৯-২০

দেবসেনাপতির অন্তর্দ্ধানে ভীত হইয়া দেবতাগণও পলায়ন করিতে আরম্ভ কারলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইন্দ্র রাক্ষসরাজ-পুত্রকে পরাজিত করিলেন। তখন রাবণনন্দন সুকৌশলী মেঘনাদ পশুপতির নিকট হইতে প্রাপ্ত মায়া যুদ্ধের কৌশল প্রয়োগ করিলেন। ইন্দ্রের সারথি মাতলি বাণাঘাতে জর্জ্জরিত হইলে ইন্দ্র রথ ত্যাগ করিলেন এবং ঐরাবতপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মায়া দ্বারা মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য মেঘনাদ ইন্দ্রকে বাণদ্বারা জর্জ্জরিত করিলেন। ইন্দ্র ক্লান্ত হইলেন। তখন মেঘনাদ ইন্দ্রকে মায়াপ্রভাবে

বন্ধন করিলেন এবং বলপূর্ব্বক সমরভূমি হইতে আকর্ষণ করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা রাবণকে বলিলেন—"পূর্ব্বে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে তুমি ত্রিলোক বিজয় করিবে। তুমি ত্রিলোক বিজয় প্রতিজ্ঞা সার্থক করিয়াছ। তোমার পুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে সুতরাং সে জগতে ইন্দ্রজিৎ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।"

জিতং হি ভবতা সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং স্বেন তেজসা।
কৃতা প্রতিজ্ঞা সফলা প্রীতোঽস্মি সসুতস্য তে।।
অয়ঞ্চ পুত্রোঽতিবলস্তব রাবণ বীর্য্যবান্।
জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি॥ ৭.৩৫।৪-৫

মাহিষ্মতীরাজ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ ও বন্ধুত্ব

ব্রহ্মার অনুরোধে ইন্দ্রজিৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে মুক্তি দিলেন। ইন্দ্র বৈষ্ণব যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র জয়ের পরে রাবণ অন্যান্য রাজন্যবর্গকে নিপীড়ন করিয়া মাহিষ্মতী নগরে উপস্থিত হইলেন। তখন মাহিষ্মতীরাজ অর্জ্জুন জলক্রীড়া করিতেছিলেন। রাবণ স্বয়ং নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিয়া পাপ প্রক্ষালন করিলেন। তারপর তিনি বিধিবৎ মন্ত্র জপ করিলেন এবং জাম্বুনদময় (স্বর্ণময়) শিবলিঙ্গ বেদিকামধ্যে স্থাপন করিয়া সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পদ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে সর্ব্বতোভাবে পূজা ও অর্চ্চনা করিলেন।

পরদিন অর্জ্জুন এবং রাবণের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন দশাননকে বন্ধন করিলেন এবং বন্দী রাক্ষসরাজকে সঙ্গে লইয়া স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। রাবণের বন্ধনদশা শ্রবণ করিয়া পুলস্ত্য-ঋষি মাহীষ্মতীরাজ অর্জ্জুনকে রাবণবিজেতৃরূপে অভিনন্দন জ্ঞাপন

করিলেন এবং রাবণের মুক্তির জন্য অনুরোধ করিলেন। তারপর রাবণ ও অর্জ্জুন পরস্পর আভরণ, মাল্য ও বস্ত্র বিনিময় দ্বারা পরস্পরকে সম্মানিত করিলেন এবং অগ্নি সম্মুখে হিংসাবিহীন বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন।

পুলস্ত্যাজ্ঞাং প্রগৃহ্যাথ ন কিঞ্চন বচোঽর্জ্জুনঃ।
পার্থিবেন্দ্রো মুমোচৈব রাক্ষসেন্দ্রং প্রহৃষ্টবৎ॥
স ত্বং প্রমুচ্য ত্রিদশারিমর্জ্জুনঃ
প্রপূজ্য দিব্যাভরণস্রগম্বরৈঃ।
অহিংসকং সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকং
প্রণম্য তং ব্রহ্মসুতং গৃহং যযৌ॥ ৭।৩৮।১৭-১৮

রাবণ তারপর কিষ্কিন্ধ্যা নগরে উপস্থিত হইয়া বানররাজ বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। সেই সময়ে বানররাজ বালী সন্ধ্যা করিবার জন্য দক্ষিণ সাগরে গমন করিয়াছিলেন। রাবণ তৎক্ষণাৎ পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যা উপাসনায় নিরত বালীর দিকে অগ্রসর হইলেন। বালী রাবণের আগমন ও মন্দ অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া উদ্বিগ্ন হইলেন না, এবং স্থির ভাবে মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক বেদমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাবণ বালীর নিকট উপস্থিত হইলে বালী রাবণকে কুক্ষিজাত করিলেন এবং সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বানররাজ বালী রাক্ষসরাজ রাবণকে কুক্ষিমুক্ত করিয়া পরিহাস পূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাবণ আত্মপরিচয় দিয়া বালীর নিকট চিরবন্ধুত্ব প্রার্থনা করিলেন। বানররাজ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। রাবণ একমাস কাল কিষ্কিন্ধ্যায় বাস করিয়া রাক্ষস-বন্ধুত্বকে সম্মানিত করিলেন। অতঃপর রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাবণ তাঁহার পৃথিবী জয়ের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন।

রাক্ষসরাজের জীবনে সর্ব্বশেষ যুদ্ধ হইয়াছিল অযোধ্যার রাজকুমার রামচন্দ্রের সহিত এবং সেই যুদ্ধে রাবণ প্রায় সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসরাজের ভ্রাতা বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

রাবণের যুদ্ধ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী আলোচনা করিলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ঃ—

রাক্ষস যুদ্ধনীতি

(১) রাবণের প্রতিপক্ষ ছিল দেবতা, দৈত্য, দানব, মানব, নাগ ও যক্ষ এবং দেবতার সমর্থক গোষ্ঠী ছিল বসু, আদিত্য, মরুত্ত, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব। সাধারণতঃ রাক্ষসপক্ষে ছিল দৈত্য, দানব, অসুর ইত্যাদি গোষ্ঠী। ভারতের সমস্ত রাক্ষসই যে রাবণের আজ্ঞাবহ ছিল তাহা নহে, কারণ রাবণ রাক্ষসকন্যাও হরণ করিয়াছিলেন।

(২) রাবণ কোন যুদ্ধই পূর্ব্বাহ্নে ঘোষণা করিয়া আরম্ভ করেন নাই। কুবেরের দূতের নিকট রাবণ যুদ্ধের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বধ করার সংবাদ কুবেরের কর্ণগোচর হয় নাই। যুদ্ধ আরম্ভ বা সমাপ্তির জন্য কোন দূত প্রেরিত হয় নাই। ইন্দ্র ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধের পর ব্রহ্মা স্বয়ং ইন্দ্রের মুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মান্ধাতার যুদ্ধের পরে পুলস্ত্য এবং গালব রাবণ ও মান্ধাতা দুজনকেই যুদ্ধে নিরস্ত করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের পরে পুলস্ত্যের পরামর্শে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। বালীর নিকটে পরাজিত হইয়া রাবণ স্বয়ং বালীর বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

(৩) যুদ্ধনীতি অনুসারে দূত অবধ্য। কিন্তু রাবণ স্বয়ং কুবেরের দূতকে নিধন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে রাবণ মহাবীর হনুমানকে নিধন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বিভীষণের পরামর্শে তিনি অগ্নি সংযোগে হনুমানকে বিরূপিত করিবার চেষ্টা মাত্র করিয়াছিলেন।

(৪) রাবণ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লঙ্কা ব্যতীত

প্রত্যক্ষভাবে কোথাও রাজ্যশাসন করেন নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু রাক্ষস বাস করিত। অযোধ্যা ও মিথিলার মধ্যবর্ত্তী করূষ এবং মলদ অঞ্চলে তাড়কা, সুবাহু ও মারীচ নামক বীর রাক্ষস বাস করিতেন। রাবণের আদেশে অথবা ইঙ্গিতে সুবাহু ও মারীচ মুনি ঋষিদের যজ্ঞ-ভঙ্গ করিতেন। বিরাধ, কবন্ধ প্রভৃতি রাক্ষস রাবণের শাসনাধীন ছিলেন না। একমাত্র দণ্ডকারণ্যে রাবণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত শূর্পণখা খরও দূষণের সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন। রাবণ দিগ্বিজয় উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। অধিকাংশ যুদ্ধেই তিনি জয়ী হইয়াছেন; অতি অল্প ক্ষেত্রেই বিজিত হইয়াছেন। রাবণ মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে সন্ধি করিয়াছেন। নিবাত কবচ দৈত্যকুল ব্যতীত অতি অল্পস্থলেই তিনি সমগ্র জাতি বা প্রজাপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। এই যুগের যুদ্ধ আলোচনা করিলে মনে হয় যে, রাজা বিজিত হইলেই রাজ্যও বিজিত হইত। রাজার পরাজয়ের পরে পরাজিত রাজ্যের প্রজাবর্গের সহিত রাবণের কোন যুদ্ধ হয় নাই।

(৫) রাবণ বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা কয়েকটি রাজ পরিবারের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিলেন—দানবরাজ ময়, গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুষ, দৈত্যরাজ বলী এবং মধু। কিন্তু কালকেয় দানবগণ রাবণের ভগিনী শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বের সমগোষ্ঠী হইলেও তাহাদিগের সহিত রাবণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশ্য পরে কালকেয় দৈত্যদিগের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৬) রাবণের কোন সৈন্য বা সেনাপতি আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া রামায়ণের কোথাও উল্লেখ নাই।

পরিশিষ্ট (ক)

রাক্ষসের যুদ্ধনীতি

রামায়ণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে রাক্ষসগণ প্রধানতঃ দুই প্রকার যুদ্ধ করিয়াছে—সম্মুখ-যুদ্ধ এবং মায়া-যুদ্ধ।

রাবণ প্রথমেই কৈলাসে অলকাপুরীতে যক্ষরাজ কুবেরকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করেন। রাবণ ইক্ষ্বাকুবংশীয় অনরণ্যকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। মান্ধাতার সঙ্গে রাবণের দ্বৈরথ যুদ্ধ হইয়াছে, সন্ধি দ্বারা যুদ্ধ সমাপ্তি হইয়াছে। লঙ্কার যুদ্ধের সময় রাবণের সঙ্গে সুগ্রীব, হনুমান এবং শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখ যুদ্ধ হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত রাবণ সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

রাবণের যুদ্ধনীতির মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে—শত্রু বশ্যতা স্বীকার করিলে রাবণ দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করেন নাই। তিনি পরাজিত রাজাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। পরাজিত শত্রুকে তিনি দাস পর্য্যায়ভুক্ত করেন নাই।

মায়াযুদ্ধ

রাক্ষসদের যুদ্ধের ইতিহাসে মায়াযুদ্ধ একটি বিরাট স্থান অধিকার করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই মায়াযুদ্ধ দ্বারা কি বুঝায়? কারণ কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী আক্রমণ করিলে যক্ষ সেনাপতি মণিভদ্র বলিয়াছিলেন—রাক্ষসগণের যুদ্ধ 'মায়াবলাশ্রিত', কিন্তু যক্ষগণের যুদ্ধ 'সরলতাপূর্ণ'। মায়া-যুদ্ধে রাক্ষসগণ অধিকতর প্রবল ছিল।

> ক্ব চ যক্ষার্জ্জবং যুদ্ধং ক্ব চ মায়াবলাশ্রয়ম্।
> রক্ষসাং পুরুষব্যাঘ্র তেন তেঽভ্যধিকা যুধি॥ ৭।১৫।৭

রাক্ষসগণ বিমানে আরোহণ করিয়া অতি অল্প সময়ে বহুদূরে

গমন করিতে পারিত। রাবণ পুষ্পকরথে আকাশে অবস্থান করিয়া বরুণ-পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। রাবণকে আকাশে পুষ্পক রথে দর্শন করিয়া বরুণতনয়গণ মহীতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে আকাশে উত্থিত হইলেন।

আকাশযুদ্ধ

মহীতলগতাস্তে তু রাবণং দৃষ্ট্বা পুষ্পকে।
আকাশমাশু বিবিশুঃ স্যন্দনৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ ॥
মহদাসীত্ততস্তেষাং তুল্যং স্থানমবাপ্য তৎ।
আকাশযুদ্ধং তুমুলং দেববদানবয়োরিব। ৭।২৩।৩৩-৩৪

ইহাতে বুঝা যায় যে, রামায়ণের যুগে আকাশযুদ্ধ, রথ এবং বিমান ছিল। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের আকাশযুদ্ধ হইয়াছিল। রথ শব্দটি ব্যাপক। রথ অর্থে যে কোন যানবাহন বুঝায়। বিমান অর্থে আকাশগামী যান বুঝায়। বিমান-যুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে আকাশ-যুদ্ধই ইঙ্গিত করে। রথ গর্দ্দভ, গজ, অশ্ব, উষ্ট্র ও মানব-বাহিত ছিল।*

তস্য চৈব শিরো নাস্তি ন বাহূ জানুনী ন চ।
ন ধনুর্ন রথো নাশ্বাস্তত্রাদৃশ্যন্ত নেষবঃ ॥ ৫।৪৪।১৭
সর্পৈরুষ্ট্রৈঃ খরৈশ্চৈব সিংহদ্বিপমৃগদ্বিজৈঃ।
অনুজগ্মুশ্চ তং ঘোরং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৬।৬৫।২৫

রামায়ণে মায়াযুদ্ধ কথাটি ব্যাপক ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। রামায়ণের যুগে দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, দানব, বানর সকলেই ইচ্ছামত রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিত। মারীচ মায়া দ্বারা মৃগরূপ ধারণ

---

* রামায়ণে উল্লেখ আছে সর্প, শিশুমার, বরাহ ও পক্ষীর উপরে আরোহণ করিয়া বীরগণ যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। এই বাহনগুলি প্রতীক—অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের পতাকা ছিল অথবা রথগুলি বিভিন্ন আকারে নির্ম্মিত হইত। রথের আকার অথবা পতাকা অনুসারে বাহন বা বাহকের নামকরণ হইত। সুতরাং রামায়ণ আলোচনায় রথ একমাত্র শাব্দিক অর্থ প্রযুক্ত হইবে না।

করিয়াছিলেন। রাবণ সন্ন্যাসীরূপ ধারণ করিয়া সীতাহরণ করিয়াছেন। হনুমান ইচ্ছানুসারে দেহের সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিতে পারিতেন। মেঘনাদ অন্তরীক্ষে মেঘের অন্তরালে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থানুসারে আকাশে ধূম্রলোক বা মেঘ সৃষ্টি করা যায়, অগ্নিবৃষ্টি করা যায়, জলপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। বর্ত্তমান যুগে অগ্নিস্রাবী নালিক অস্ত্রের (কামান বন্দুক) ব্যবহার অতি সাধারণ ব্যাপার। রামায়ণের যুগেও বর্ত্তমান যুগের মতন নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত; যথা—

কণপ (লৌহ যন্ত্রাভ্যন্তরস্থ গুলিকা)।
তুলাগুড় (যন্ত্রচালিত ভাণ্ডগোলক)।
বায়ব্য অস্ত্র (আকাশে বায়ু সঞ্চালনকারী যন্ত্র)।
গুহ্যক অস্ত্র (বায়ব্য অস্ত্রের প্রতিষেধক)।
পর্জ্জন্য অস্ত্র (আকাশে মেঘসৃষ্টিকারী যন্ত্র)।
আগ্নেয়াস্ত্র (অগ্নিস্রাবী অস্ত্র)।
বারুণাস্ত্র (জলসিঞ্চনকারী যন্ত্র)।

এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রগুলি বর্ত্তমানযুগের অতি শক্তিশালী মারণাস্ত্রের এবং ব্রহ্মাস্ত্রের অনুরূপ।

সংস্কৃত ভাষাগত মায়া শব্দটি যথেষ্ট ব্যাপক। যে বিদ্যা, যে অস্ত্র বা যন্ত্র দ্বারা প্রতিপক্ষের মনে ভ্রম সৃষ্টি করা যায়, উহাকেই মায়া নামে আখ্যায়িত করা যাইতে পারে। মায়া শব্দে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধও অনুমান করা যাইতে পারে।

রাক্ষসদের চতুরঙ্গ সৈন্য ছিল—রথ, গজ, অশ্ব, পদাতি।

চতুরঙ্গ সেনা

রাম-রাবণের যুদ্ধে রাক্ষসপক্ষে রথেরই প্রাধান্য ছিল। আকাশে ব্যবহৃত যান বিমান নামে অভিহিত হইত এবং স্থলে ব্যবহৃত যান সাধারণতঃ রথ নামে অভিহিত হইত।

রথ সম্বন্ধে রামায়ণে দুই স্থানে অতি চমৎকার বর্ণনা আছে। রাক্ষসবীর খরের রথ ছিল সুশিক্ষিত অশ্ববাহিত, স্বর্ণ খচিত, স্বর্ণচক্র সমন্বিত, ধ্বজশোভিত, সুবিস্তীর্ণ বৈদূর্য্য মণিময় কূবর (ঝালর) শোভিত এবং বিবিধ অস্ত্র পূর্ণ। এই রথটি স্বর্ণনির্ম্মিত বা স্বর্ণখচিত মৎস্য, বৃক্ষ, পুষ্প, শৈল, বিহঙ্গম, চন্দ্রকান্ত মণি খচিত, তারকা শোভিত ছিল। ধ্বজাগুলি ক্ষুদ্র ঘণ্টা ভূষিত ছিল।

রথ

……………সূর্য্যবর্ণং মহারথম্।
সদশ্বৈঃ শবলৈর্যুক্তমাচচক্ষেঽথ দূষণঃ॥
তং মেরুশিখরাকারং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
হেমচক্রমসম্বাধং বৈদূর্য্যময়কূবরম্।
মৎস্যৈঃ পুষ্পৈদ্রু্মৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রকান্তৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ।
মাঙ্গল্যৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ তারাভিশ্চ সমাবৃতম্॥
ধ্বজনিস্ত্রিংশসম্পন্নং কিঙ্কিণীবরভূষিতম্। ৩।২২।১২-১৫

পুষ্পক রথের বর্ণনা অতুলনীয়। পুষ্পক রথ ছিল কাঞ্চন স্তম্ভোপরি রক্ষিত, তোরণ ছিল বৈদূর্য্য মণিময়, মুক্তজাল দ্বারা শোভিত, অভিলষিত নানাজাতীয় ফলবান বৃক্ষদ্বারা সমৃদ্ধ; সোপানগুলি মণিকাঞ্চন নির্ম্মিত, বেদিকা সকল নির্ম্মল কাঞ্চন খচিত; অভ্যন্তর ছিল নিপুণ চিত্র শোভিত, নাতিশীতোষ্ণ, সর্ব্ব ঋতুতে সুখকর, সর্ব্বদা নয়নানন্দদায়ক। এই রথের গতি ছিল মনের গতি অপেক্ষাও দ্রুততর।

পুষ্পকরথ

পুষ্পকং তস্য জগ্রাহ বিমানং জয়লক্ষণম্॥
কাঞ্চনস্তম্ভসংবীতং বৈদূর্য্যমণিতোরণম্।
মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নং সর্ব্বকামফলদ্রুমম্॥
মনোজবং কামগমং কামরূপং বিহঙ্গমম্।
মণিকাঞ্চনসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্॥
নির্ম্মিতং সর্ব্বকামৈস্তু মনোহরমনুত্তমম্।
ন তু শীতং ন চোষ্ণঞ্চ সর্ব্বর্ত্তুসুখদং শুভম্॥ ৭।১৫।৩৫-৩৯

রাক্ষসগণ ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিত ; যথা— অর্দ্ধচন্দ্র, ক্রৌঞ্চ, গরুড় (সুপর্ণ), চক্র, বজ্র, মকর, মণ্ডলার্দ্ধ, শকট, শৃঙ্গাটক, শ্যেন, সূচীমুখ, সর্ব্বতোভদ্র (গোলাকৃতি)।

ব্যূহ

ব্যূহের নামকরণ হইতে সৈন্য সমাবেশের রীতি ধারণা করা যায়। প্রাচীনযুগের শুক্রনীতি, কামন্দকীয় নীতি-শাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও এই সমস্ত ব্যূহের উল্লেখ আছে। মহাভারতের যুদ্ধের সময়েও এই সকল ব্যূহ রচিত হইয়াছিল।

রাক্ষসের নানাপ্রকার তুর্গ ছিল ; যথা—নাদেয়, পার্ব্বত্য, বন্য এবং কৃত্রিম। লঙ্কা রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে উহাদের বিশদ বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

যুদ্ধের পরিচ্ছদ বিষয়ে বাস, অন্তর্বাস, কবচ (তনুত্রাণ), পাতুকা, মাল্য ও উষ্ণীষের উল্লেখ আছে। রথগুলি বিবিধাকার ধ্বজা চিহ্নিত থাকিত।

পরিশিষ্ট (খ)

রাক্ষসের অস্ত্রশস্ত্র

অস্ত্রের নাম :—বাণই ছিল বাল্মীকি যুগের প্রধান অস্ত্র ; বাণ নানা প্রকার ছিল, বাণের বিভিন্ন নাম ছিল ; যথা—

অর্দ্ধ চন্দ্র বাণ—ইহার অগ্রভাগ অর্দ্ধ চন্দ্রের মত বক্র।

অঞ্জলিক—ক্ষুদ্র মূষিক বিশিষ্ট আকার বাণ।

ঐন্দ্র—এই বাণের পর্ব্ব (সন্ধি স্থল) এবং পত্র অতি সুন্দর। উহা অনুক্রমে বর্ত্তুলাকার, সুবর্ণ মণ্ডিত। পুরাকালে এই বাণ দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ ঐন্দ্র বাণ দ্বারা ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন।

কর্ণী বা কণিক—কুটিলাকার বাণ।

ক্ষুরপ—ক্ষুরের ন্যায় অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, পার্শ্বদেশ ধারাল।

নতপর্ব্ব—এই বাণের সন্ধিস্থল অবনত।

নারাচ—লৌহময় বাণ।

অর্দ্ধ নারাচ—লৌহ সমন্বিত মিশ্রধাতু নির্ম্মিত বাণ।

নালীক—এই বাণের অন্তঃস্থল সচ্ছিদ্র। নালীক বাণের অন্তঃস্থল হইতে আগ্নেয় ভস্ম বা লৌহ গোলক নিক্ষেপ করা যায়। বর্ত্তমান যুগের বন্দুকের ন্যায়।

ব্যৎস দণ্ড—গো বৎস মুখের মত বিস্তীর্ণ মুখ দণ্ডাকার বাণ।

বিপাঠ—স্থূলমুখ বাণ।

শংকু—হস্তিকর্ণের মতন বাণ।

শিলীমুখ—ভ্রমরমুখ বাণ।

স-পক্ষ—পক্ষীর পালকযুক্ত বাণ।

সর্পবাণ—সর্পাকৃতি দীর্ঘ বাণ।

স্বর্ণ পক্ষ—সুবর্ণ খচিত ময়ূরপুচ্ছ শোভিত বাণ।

সুমুখ—নাগ মুখাকৃতি বাণ।

বাণ শব্দ বিভিন্ন প্রকার—অস্ত্রও বুঝায় ; যথা—রাবণ যমের সঙ্গে যুদ্ধে এক প্রকার বাণ নিক্ষেপ করিলেন। উহা দাবানলের মতন ধূপ ও জ্বালা মণ্ডল সৃষ্টি করিয়া গুল্ম ও বৃক্ষ সমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ধাবিত হইল।

ইষুপল—ইহার মধ্যে গোলাকৃতি পিণ্ড থাকে। সাধারণতঃ সুদীর্ঘ লম্বমান সেতু এই যন্ত্রের উপর স্থাপিত থাকে। শত্রু সেনা সেতু অতিক্রমণ কালে ইহা চালনা করিলে শত্রু সেতু হইতে বিচ্যুত হয় এবং জলে নিমজ্জিত হয়। রাবণ লঙ্কা রক্ষার জন্য এই প্রকার ইষুপল যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন।

উল্কা—অগ্নি সংযোগের যন্ত্র।

কণপ—ইহা লৌহ যন্ত্র অভ্যন্তরস্থ গুলিকা আগ্নেয় শক্তিতে তারকার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে।

কুলিক—বজ্রের মত অস্ত্র।

ক্ষুর—অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, পার্শ্বভাগ ধারাল ও ঋজু।

সিংহদংষ্ট্র(ক্ষুর)—সিংহের দন্তের ন্যায় অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ অস্ত্র।

গদা—মুদ্গর, লৌহ নির্ম্মিত, কাষ্ঠ নির্ম্মিত, কখনো চতুষ্কোণ, কখনো অষ্টকোণ।

চক্র—গোলাকার ধারাল লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র।

তুলাগুড় বা ভাণ্ডগোলক—ইহা যন্ত্রচালিত এবং সশব্দে নির্গত হয়।

তোমর—দীর্ঘাকৃতি দণ্ড, ইহা হস্ত দ্বারা নিক্ষেপ করা যায়; লৌহ শাবলের মতন।

ধনু—কাষ্ঠ বা বংশ হইতে প্রস্তুত, কখনো পশু-শৃঙ্গদ্বারা প্রস্তুত হইত। বাল্মীকি যুগে ধনু ছিল প্রধান অস্ত্র।

পট্টিশ—খড়্গ, উহার দুই দিকেই ধার থাকে।

পরশ্বধ—পরশু, কুঠার।

পরিঘ—কন্টকময় লৌহ দণ্ড।

পাশ—রজ্জু, শত্রুর গলদেশে নিক্ষেপ করিয়া শত্রুকে আকর্ষণ করা হয়।

প্রাস—ভল্ল বা 'ভালা' বিশেষ—হস্ত দ্বারা নিক্ষেপ করা হইত। ইহার অগ্রভাগ বক্র।

বিপাঠ—দধি মন্থন মতন দণ্ড।

ব্রহ্মশির—ব্রহ্ম তেজময় মহাপ্রভ অস্ত্র বিশেষ।

ভিন্দিপাল—ক্ষুদ্র বা গুড়, ইহা হস্ত দ্বারা নিক্ষেপ করা যায়।

ভুশুণ্ডী—চর্ম্ম ও রজ্জু দ্বারা নির্ম্মিত যন্ত্র, ইহার দ্বারা পাষাণ খণ্ড দূরে নিক্ষেপ করা যায়।

যষ্টি—দণ্ড; বংশ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত।

শক্তি—লৌহ দণ্ড; নিম্নদেশ, স্থূলাকৃতি; ইহা হস্ত দ্বারা নিক্ষেপ করা যায়।

শতঘ্নী—শতঘ্নী লৌহ কণ্টক বেষ্টিত, বিরাট শিলাখণ্ড; শকট বা চক্রের উপর স্থাপন করিয়া শতঘ্নীকে রণভূমিতে আনয়ন করা হইত। দুর্গ প্রাচীরের উপরে শতঘ্নী স্থাপন করিয়া সম্মুখগত শত্রুর উপর প্রয়োগ করা হইত। ফলে শতলোক একসঙ্গে নিহত হইত। এইজন্যই নাম শতঘ্নী।

শূল—লৌহ নির্ম্মিত দীর্ঘ দণ্ড; অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ।

শল্য—কণ্টকময় শূল। বিভিন্ন জাতীয় অস্ত্র। ঐগুলি নানা আকারের ছিল।

বায়ব্য অস্ত্র—ইহার আকর্ষণ দ্বারা বায়ুর গতি বৃদ্ধি করা যাইত। ইহার প্রতিষেধক ছিল গুহ্যক অস্ত্র।

পর্জ্জণ্য অস্ত্র—ইহা দ্বারা আকাশে মেঘ সৃষ্টি করা যাইত, ভূনিম্ন হইতে জল আকর্ষণ করা যাইত।

আগ্নেয়াস্ত্র—ইহা হইতে অগ্নিগোলক, অগ্নিস্রাবী ধূম্র নির্গত হইত। ইহার প্রতিরোধক ছিল বরুণাস্ত্র, উহা দ্বারা জল সিঞ্চন করা যাইত।

সম্মোহন অস্ত্র—ইহা এক প্রকার বিষবাস্প বলিয়া মনে হয়। এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে মানুষের নিঃশ্বাসে কষ্ট হইত এবং শত্রু সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িত। ইহার প্রতিষেধক ছিল প্রজ্ঞাস্ত্র।

এই সকল অস্ত্র ছিল বিশেষ শক্তি সম্পন্ন, সুতরাং এই অস্ত্রকে দৈবাস্ত্র আখ্যা দেওয়া হইত। সাধারণ যোদ্ধা এই অস্ত্রের ব্যবহার জানিত না। বিশেষ দেবতার নামে ঐ সমস্ত অস্ত্র সংযোজিত করা হইত; যথা—পাশুপাত, ঐন্দ্র, ব্রাহ্ম ইত্যাদি। অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, পরশুরাম, জমদগ্নি প্রভৃতি ঋষিগণও ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ ছিলেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেই শস্ত্রবিদ্যা বিশারদ ছিল; অবশ্য শস্ত্র ও অস্ত্র চালনা ক্ষত্রিয়ের জীবিকা ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

লঙ্কার ঐশ্বর্য্য

ব্রহ্মার বরলাভে নির্ভয় হইয়া রাক্ষসগণ বিশ্বকর্ম্মাকে তাহাদের বাসের নিমিত্ত একটি পুরী নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করিল। বিশ্বকর্ম্মা দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট ও সুবেল নামক দুইটি পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী শিখরদেশে অবস্থিত লঙ্কা নগরীতে বাস করিতে পরামর্শ দিলেন। এই নগরী ছিল শত যোজনব্যাপী দীর্ঘ, ত্রিংশ যোজনব্যাপী প্রশস্ত, সুবর্ণ প্রাচীর বেষ্টিত, স্বর্ণতোরণ বিভূষিত। লঙ্কা নগরী দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

লঙ্কার সংস্থান

দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ ॥
সুবেল ইতি চাপ্যন্যো দ্বিতীয়ো রাক্ষসেশ্বরাঃ।
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমেঽম্বুদসন্নিভে ॥
শকুনৈরপি দুষ্প্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নে চতুর্দ্দিশি।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা ॥
স্বর্ণপ্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবৃতা।
ময়া লঙ্কেতি নগরী শক্রাজ্ঞপ্তেন নির্ম্মিতা ॥ ৭।৫।২২-২৫

রাক্ষসরাজ সুমালী লঙ্কায় অধিষ্ঠিত হইয়া দেবতাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। দেবতাবৃন্দের অনুরোধে বিষ্ণু রাক্ষসদিগকে বাণ-জালে বিধ্বস্ত করিলেন। সেখানে রাক্ষসকুল সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিল।

সুমালী পাতালে প্রস্থান করিলে লঙ্কা নগরীতে বিশ্রবা তনয় যক্ষরাজ কুবের রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, পরে সুমালী দুহিতা কৈকসীর গর্ভজাত পুত্র রাবণ তপস্যা প্রভাবে অসীম শক্তি ও ব্রহ্মার বরে অমরত্ব লাভ করিলেন। সুমালী রাবণের শক্তি ও বর লাভের

সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে লঙ্কা পুনরধিকার করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথমে রাবণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের সঙ্গে বিরোধ করিতে অস্বীকার করেন। কুবের পরিশেষে স্বেচ্ছায় রাবণকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের অধিকৃত লঙ্কা নগরী প্রত্যর্পণ করিলেন; এবং কৈলাসে নূতন যক্ষপুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় প্রস্থান করিলেন। ইহার পর হইতে রাবণ লঙ্কায় রাজত্ব আরম্ভ করেন।

লঙ্কার বর্ণনাঃ—অরণ্যকাণ্ডের চুয়ান্ন সর্গে উল্লিখিত আছে—রাবণ সীতাকে অঙ্কে লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন। লঙ্কার প্রথম পরিচয়ে বাল্মীকি লিখিলেন—

> সোঽভিগম্য পুরীং লঙ্কাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
> সংরূঢ়কক্ষ্যাং বহুলাং স্বমন্তঃপুরমাবিশৎ॥ ৩।৫৪।১২

লঙ্কার পথ

মহাকবি বাল্মীকি লঙ্কার বিবরণ প্রদানের অবসরে আরম্ভেই উল্লেখ করিলেন পথের কথা—সুবিশাল পথ, সুবিভক্ত, সুবিস্তৃত, বহু জনাকীর্ণ, বৃহৎ অট্টালিকা শোভিত। প্রথমেই দূর হইতে পথ, পথচারী ও বাসগৃহগুলি বহিরাগত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তারপর রাক্ষসরাজ রাবণ অপহৃতা সীতাকে অন্তঃপুরে একটি মনোরম কক্ষে আনয়ন করিলেন—উদ্দেশ্য অযোধ্যার রাজবধূকে রক্ষরাজ অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইয়া মুগ্ধ করিবেন। অনিচ্ছুক সীতাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বীর্য্যবান রাবণ গজদন্ত নির্ম্মিত সুবর্ণমণ্ডিত সোপানে আরোহণ করাইলেন। এখানে বাল্মীকি রাক্ষসরাজের অন্তঃপুরের বর্ণনা করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

রাবণের অন্তঃপুর

রাক্ষসরাজের অন্তঃপুর ছিল হর্ম্ম্যমালা সমাকীর্ণ বহুবিধ রত্ন বিভূষিত, নানাজাতীয় পক্ষীকূজন মুখরিত। অন্তঃপুর বাটিকা ছিল সুবর্ণ, রজত, স্ফটিক ও

বৈদূর্য্যমণি খচিত, স্তম্ভোপরি সন্নিবেশিত, বহু গবাক্ষযুক্ত। গবাক্ষগুলি ছিল সুবর্ণ জাল পরিবৃত।

স বলাদ্দর্শয়ামাস গৃহং দেবগৃহোপমম্ ॥
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্বাধং স্ত্রীসহস্রনিষেবিতম্।
নানাপক্ষিগণৈর্জুষ্টং নানারত্নসমন্বিতম্ ॥
দান্তকৈস্তাপনীয়ৈশ্চ স্ফাটিকৈ রাজতৈস্তথা।
বজ্রবৈদূর্য্যচিত্রৈশ্চ স্তম্ভৈর্দৃষ্টিমনোরমৈঃ ॥
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
সোপানং কাঞ্চনং চিত্রমারুরোহ তয়া সহ ॥
দান্তকা রাজতাশ্চৈব গবাক্ষাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
হেমজালাবৃতাশ্চাসন্ তত্র প্রাসাদপঙ্ক্তয়ঃ ॥ ৩।৫৫।৬-১০

সীতাকে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দ্বারা প্রলুব্ধ করিবার জন্য রাবণ নিজের অন্তঃপুরের বর্ণনা করিলেন—

দশ রাক্ষসকোট্যশ্চ দ্বাবিংশতিরথাপরাঃ।
বর্জ্জয়িত্বা জনান্ বৃদ্ধান্ বালাংশ্চ রজনীচরান্ ॥
সহস্রমেকমেকস্য মম কার্য্যপুরঃসরম্ ॥ ৩।৫৫।১৪-১৫

সুন্দরকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে উল্লেখ আছে—মহাবীর্য্যশালী হনুমান দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছেন। বন উপবন সরোবর সমাকীর্ণ লঙ্কানগরী দর্শনে হনুমান চমৎকৃত হইলেন। সেই বন উপবনে স্থলপদ্ম, কর্ণিকার, খর্জ্জুর, পিয়াল, জম্বীর (জামীর), কুটজ (কুটী), কেতকী (কেয়া), প্রিয়াঙ্গ, নীপ (কদম্ব), সপ্তপর্ণী (ছাতিম), আসন, কোবিদার (কাঞ্চন বৃক্ষ) ও করবী সমাচ্ছন্ন ছিল।

লঙ্কার-উদ্যান বৃক্ষরাজী

সরোবরগুলি হংস কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষীসেবিত ছিল। সরোবরের তীরদেশ সর্ব্বঋতুতে ফলবান বৃক্ষরাজি শোভিত ছিল। এই অপূর্ব্ব শোভাময়ী নগরী নিরীক্ষণ করিতে করিতে হনুমান সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। হনুমান দেখিলেন—লঙ্কা নগরী কনকময় প্রাচীর বেষ্টিত, লঙ্কার প্রাসাদগুলি শারদীয় মেঘের মত শুভ্রবর্ণ এবং রথগুলি স্নিগ্ধ

পাণ্ডুর বর্ণ। নগরীর তোরণগুলি ছিল সুবর্ণময়। এই লঙ্কা নগরী ছিল ধ্বজ পতাকা শোভিত এবং ধনুর্ব্বাণধারী রাক্ষস সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত।

কাঞ্চনেনাবৃতাং রম্যাং প্রাকারেণ মহাপুরীম্।
গৃহৈশ্চ গিরিসঙ্কাশৈঃ শারদাম্বুদসন্নিভৈঃ॥
পাণ্ডুরাভিঃ প্রতোলীভিরুচ্চাভিরভিসংবৃতাম্।
অট্টালকশতাকীর্ণাং পতাকাধ্বজশোভিতাম্॥
তোরণৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যৈর্লতাপঙ্‌ক্তিবিরাজিতৈঃ।
দদর্শ হনুমান্ লঙ্কাং দেবো দেবপুরীমিব॥ ৫।২।১৬-১৮

হনুমান সীতাকে অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছেন—তখন প্রভাতকাল। তিনি ভাবিলেন, রাক্ষসের দৃষ্টি পথে পতিত হইলে বিপদের সম্ভাবনা এবং কার্য্যসিদ্ধিতে ব্যাঘাত সুনিশ্চয়। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, রাত্রির অন্ধকারে লঙ্কার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রতিগৃহে জানকীর সন্ধান করিবেন। হনুমান রাত্রির আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। সূর্য্যদেব অস্তাচলবাসী হইলে তিনি অতি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিয়া লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—

প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং প্রবিভক্তমহাপথাম্॥
প্রাসাদমালাবিততাং স্তম্ভৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ।
শাতকুম্ভনিভৈর্জালৈর্গন্ধর্ব্বনগরোপমাম্।
সপ্তভৌমাষ্টভৌমৈশ্চ স দদর্শ মহাপুরীম্॥
স্থলৈঃ স্ফটিকসঙ্কীর্ণৈঃ কার্ত্তস্বরবিভূষিতৈঃ।
তৈস্তৈঃ শুশুভিরে তানি ভবনান্যত্র রক্ষসাম্। ৫।২।৪৮—৫০

হনুমান দেখিলেন, নগরী সুবিশাল পথসমূহ দ্বারা সুবিভক্ত, প্রাসাদগুলি স্তম্ভোপরি স্থাপিত, চতুর্দ্দিক পথসমূহে পরিবৃত; সুবর্ণ খচিত প্রাসাদগুলির গবাক্ষ কনকময়। প্রাসাদ কোনটি এক ভূমিক, কোনটি সপ্তভূমিক, সপ্ত বা অষ্টখণ্ডে বিভক্ত; স্ফটিক রত্ন শোভিত। প্রাসাদ সমন্বিত লঙ্কাপুরী গন্ধর্ব্ব নগরীর মতন শোভা পাইতেছিল।

হনুমান লঙ্কা প্রবেশের উদ্দেশ্যে প্রাচীরের উপর আরোহণ করিলেন। প্রথমেই লঙ্কার সিংহদ্বার তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অপূর্ব্ব সেই সিংহদ্বারের বেদি স্ফটিক, মণি, মুক্তা, বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি রত্ন দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। কুট্টি বা গৃহতল জাম্বুনদময় (সুবর্ণ) মণি খচিত; উপরিভাগ রৌপ্যের ন্যায় পাণ্ডুর, সোপানরাজি বৈদূর্য্যমান খচিত।

লঙ্কার সিংহদ্বার

হনুমান দেখিলেন, এক বিকটবদনা ভীমদর্শনা নারী সিংহদ্বার রক্ষা করিতেছেন। তিনি হনুমানকে দ্বার অতিক্রম করিতে প্রতিরোধ করিলেন। এই ভীমদর্শনা নারী স্বয়ং লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী; তিনি রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া লঙ্কানগরী রক্ষা করিতেছিলেন। হনুমানের নিকট রাক্ষসরূপিনী নারী আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমি লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী, তোমাকে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে দিব না।" এই বলিয়া সেই নারী হনুমানকে আঘাত করিলেন। কিন্তু নারী অবধ্যা, সুতরাং নারীকে নিধন করিলেন না, আহত হইয়া লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী হনুমানকে সিংহদ্বার অতিক্রম করিতে দিয়া বলিলেন— হে বানর শ্রেষ্ঠ, আমি অনুমান করিলাম রাবণ-পালিত লঙ্কাপুরীর অনর্থ সন্নিকট। ইচ্ছানুরূপ তুমি স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন কর।

হনুমান সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, লঙ্কানগরী সর্ব্বত্র সুসজ্জিত, নগরী সুমধুর শব্দ মুখরিত, হীরক খচিত বাতায়ন-পরিবৃত, বজ্রকার ও অঙ্কুশাকার গৃহমালা সমন্বিত। হনুমান ক্ষুদ্রদেহ ধারণ করিয়া গৃহ হইতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। প্রধান প্রধান রাক্ষসদের গৃহে কোথাও তিনি গীতধ্বনি শ্রবণ করিলেন, কোথাও বা কাঞ্চী (মেখলা) এবং নূপুর শিঞ্জনের শব্দ, কোথাও মৃগনাদ, কোথাও সিংহনাদ, কোথাও বা অধ্যয়ন নিরত রাক্ষসদিগের মন্ত্রধ্বনি শ্রবণ করিলেন। কোথাও হনুমান বেদাধ্যায়ী পূজানিরত নিশাচর রাবণের স্তুতি পাঠে নিয়োজিত দেখিলেন। ক্রমশঃ হনুমান

লঙ্কার গৃহ ও ধর্ম্মীয়ভাব

দেখিলেন কনক-নির্ম্মিত জালরন্ধ্রে বিভূষিত উজ্জ্বল সহস্র-লোকবহন-ক্ষম বিবিধাকার শিবিকা, বিবিধ সভাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, রতিগৃহ, দিবা-কালিন বিহারগৃহ, চিত্রপট শোভিত গৃহ, ক্রীড়ার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত কৃত্রিম পর্ব্বত। স্থানে স্থানে নৃত্যপরায়ণ ময়ুর ময়ূরী ক্রীড়া করিতেছে। পর্ব্বতের চূড়ায় রমণীয় ধ্বজা।

রাবণের শয়নশালার সোপান পংক্তি রত্নরাজি দ্বারা সুকৌশলে নির্ম্মিত। নিম্নভাগ স্ফটিক প্রস্তরে আবৃত ছিল। বাতায়ন কনকময়, শয়নকক্ষে গজদন্ত, মণিমুক্তা রৌপ্য সুবর্ণময় মূর্ত্তি শোভিত। গৃহের অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ আস্তরণ বিস্তৃত ছিল।

শয়নশালা

গৃহপ্রাচীরের বর্ণ হংসপাণ্ডুর, গৃহ বিহঙ্গ কূজন মুখরিত, মনোহর সৌরভ সুবাসিত অগুরু মিশ্রিত ধূপধূমে নিরন্তর ধূম্রবর্ণ ছিল।

হনুমান মনে করিলেন, ইহা কি লঙ্কাপুরী না যজ্ঞশালা, না স্বর্গ, না দেবলোক, না ইন্দ্রপুরী, অমরাবতী অথবা গন্ধর্ব্বমায়া।

শয়নশালা ছিল বহুনারী পরিবৃতা কেহ রাজদুহিতা, কেহ ব্রাহ্মণ-তনয়া, কেহ দৈত্য সুতা, কেহ গন্ধর্ব্ব দুহিতা, কেহ রাক্ষস কন্যা সকলেই কামপরবশ হইয়া তাঁহার পত্নী হইয়াছে। রাবণ কাহাকেও যুদ্ধে জয় করিয়াছেন।

রাবণের শয়ন প্রকোষ্ঠঃ—হনুমান দেখিলেন, নানা রত্ন খচিত উৎকৃষ্ট স্ফটিক নির্ম্মিত বেদিকার উপর স্থাপিত রাবণের শয়ন পর্য্যঙ্ক। পর্য্যঙ্কের পাদসমূহ গজদন্ত ও সুবর্ণ খচিত সুতরাং বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে। সেই বেদিকা বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগাদি মণি নির্ম্মিত। সেই প্রকোষ্ঠে রমণীগণের শয়নযোগ্য মহামূল্য শ্রেষ্ঠ পর্য্যঙ্ক সজ্জিত রহিয়াছে। পর্য্যঙ্কের আস্তরণ মহামূল্য রত্নখচিত। রাবণের শয্যাপর্য্যঙ্কের উপর পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র ও মনোহর অশোকপুষ্পমালা শোভিত।

তত্র দিব্যোপমং মুখ্যং স্ফাটিকং রত্নভূষিতম্।
অবেক্ষমাণো হনুমান্ দদর্শ শয়নাসনম্॥

দান্তকাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈর্বৈদূর্যৈশ্চ বরাসনৈঃ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ॥
তস্য চৈকতমে দেশে দিব্যমাল্যোপশোভিতম্।
দদর্শ পাণ্ডুরং ছত্রং তারাধিপতিসন্নিভম্॥
জাতরূপপরিক্ষিপ্তং চিত্রভানোঃ সমপ্রভম্।
অশোকমালাবিততং দদর্শ পরমাসনম্॥ ৫।১০।১-৪

শয়ন প্রকোষ্ঠে হনুমান প্রথমে কনকবর্ণা মনোহর রূপশালিনী ময়দানব কন্যা নিদ্রিতা মন্দোদরীকে সীতা বলিয়া ভ্রম করিলেন। কিন্তু অবিলম্বে ভ্রম বুঝিলেন যে, শ্রীরামের পত্নী কখন অন্য কোন পুরুষের অন্তঃপুরিকা হইয়া নির্ভয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারেন না। সুতরাং হনুমান পার্শ্বস্থিত পানশালায় সীতাকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। হনুমান দেখিলেন, নারীদের মধ্যে কেহ অক্ষক্রীড়া, কেহ সঙ্গীত, কেহ বা নৃত্য সমাপ্ত করিয়া ক্লান্তিবশতঃ নিদ্রিতা হইয়াছেন, কেহ সুরাপান মত্ত হইয়া গাঢ়তর নিদ্রায় অচেতন, অন্য স্ত্রীগণ মুরজ মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে দেহবিন্যাস করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন।

পানশালা

তেষু তেষ্ববকাশেষু প্রসুপ্তাস্তনুমধ্যমাঃ॥
অঙ্গহারৈস্তথৈবান্যা কোমলৈর্নৃত্যশালিনী।
বিন্যস্তশুভসর্ব্বাঙ্গী প্রসুপ্তা বরবর্ণিনী॥
কাচিদ্বীণাং পরিষ্বজ্য প্রসুপ্তা সম্প্রকাশতে।
মহানদীপ্রকীর্ণেব নলিনী পোতমাশ্রিতা॥ ৫।১০।৩৫-৩৭

রাবণের পানশালা ঃ

রাবণের গৃহ প্রকোষ্ঠে অন্য একটি পানশালাও ছিল, উহা নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু সমূহে সুশোভিত সুরাপানশালা। সেই পানশালার স্থানে স্থানে মহিষ বরাহ মাংস ভাগে ভাগে সজ্জিত ছিল। স্বর্ণময় পাত্রে কুক্কুট এবং ময়ূর মাংস সঙ্গে ভক্ষিত হইয়াছে।

কোথাও বা মৃগ, বরাহ, ময়ূর এবং কৃষ্ণগ্রীব, রক্তশীর্ষ, চক্রবাক এবং শ্বেতপক্ষ পক্ষী বিশেষের মাংস লবণ দ্বারা চর্চ্চিত হইয়াছে। অন্যস্থানে অর্দ্ধভক্ষিত ছাগ, কৃকলস, শশক, মহিষমাংস, কোথাও সুপক্ক ফল, কোথাও বা নানা প্রকার লেহ্য পেয় ভোজ্য, কোথাও অম্ল, লবণ, শর্করা, মধু এবং দ্রাক্ষা মিশ্রিত কুঙ্কুমগন্ধি ও নানাবর্ণ রঞ্জিত খাদ্যসামগ্রী স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে।

ভোজ্য দ্রব্য

মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ বরাহাণাঞ্চ ভাগশঃ।
তত্র ন্যস্তানি মাংসানি পানভূমৌ দদর্শ সঃ॥
রৌক্মেষু চ বিশালেষু ভাজনেষ্বথ ভক্ষিতান্।
দদর্শ কপিশার্দ্দূলো ময়ূরান্ কুক্কুটাংস্তথা॥
বরাহবার্ধ্রীণসকান্ দধিসৌবর্চ্চলাযুতান্।
শল্যান্ মৃগময়ূরাংশ্চ হনুমানন্ববৈক্ষত॥
কৃকলান্ বিবিধাংশ্ছাগান্ শশকানর্দ্ধভক্ষিতান্।
মহিষানেকশল্যাংশ্চ ছাগাংশ্চ কৃতনিষ্ঠিতান্।
লেহ্যানুচ্চাবচান্ পেয়ান্ ভোজ্যানুচ্চাবচানি চ॥
তথাম্ললবণোত্তংসৈর্বিবিধৈ রাগখাণ্ডবৈঃ। ৫।১১।১৪-১৮

পানশালা বিবিধ কুসুমে সুসজ্জিত। পশ্চাতে বৃক্ষক্ষরিত সুনির্ম্মল সুরা, শৌণ্ডিক মদ্য এবং মাংস নির্য্যাস, ফলের আসব, গন্ধদ্রব্য সুরভিত হইয়া সুশোভিত হইয়াছে। স্ফটিকনির্ম্মিত পানপাত্র, সুবর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত সুরাপূর্ণ কলস পানশালার স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। কোন কোন পাত্রস্থ সুরা অর্দ্ধপীত, কোন কোন স্থানে কেবল পানপাত্র মাত্র অবশিষ্ট। কোথাও বা সুরা বিন্দুমাত্রও পান করা হয় নাই। পানপাত্রগুলি পীত, অ-পীত, অর্দ্ধপীত।

তত্র তত্র চ বিন্যস্তৈঃ সুশ্লিষ্টশয়নাসনৈঃ।
পানভূমির্বিনা বহ্নিং প্রদীপ্তেবোপলক্ষ্যতে॥
বহুপ্রকারৈর্বিবিধৈর্বরসংস্কারসংস্কৃতৈঃ।
মাংসৈঃ কুশলসংযুক্তৈঃ পানভূমিগতৈঃ পৃথক্॥

দিব্যাঃ প্রসন্না বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি।
শর্করাসবমাধ্বীকাঃ পুষ্পাসবফলাসবাঃ ॥ ৫।১১।২২

... .

ক্বচিদর্দ্ধাবশেষাণি ক্বচিৎ পীতান্যশেষতঃ।
ক্বচিন্নৈব প্রপীতানি পানানি স দদর্শ হ ॥
ক্বচিদ্ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধান্ ক্বচিৎ পানং বিভাগতঃ।
ক্বচিদর্দ্ধাবশেষাণি পশ্যন্ বৈ বিচচার হ ॥ ৫।১১।২৭-২৮

হনুমান সীতা দেবীকে রাবণের পানশালা, কেলিগৃহ, শয়নগৃহে অনুসন্ধান করিয়া নিরাশ হইলেন। তারপর উচ্চপ্রাচীর হইতে অবতরণ করিয়া নিম্নতর প্রাচীরে উপস্থিত হইলেন। প্রাচীর গাত্রে সর্ব্বঋতুতে কুসুমিত বৃক্ষ দেখিয়া হনুমান প্রীত হইলেন। পুষ্পিত শাল, অশোক, চম্পক, নাগকেশর, বহুবারব, (বয়রা), ভব্য (চালতা), আম্রবৃক্ষ সমাকীর্ণ কানন দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। বিভিন্ন তরু সুবর্ণ ও রৌপ্যময় কারুকার্য্যে চিত্রিত। বৃক্ষাবলী সুমধুর কাকলী মুখরিত ; সেখানে কোকিল কূজন, ভৃঙ্গগুঞ্জন শ্রবণ করিলেন। উদ্যান বাটিকাতে মৃগযূথ, মত্ত ময়ূর ও হৃষ্ট মানব বিচরণ করিতেছিল।

রাবণের উদ্যান

..................দদর্শ হনুমান্ বলী ॥
প্রহৃষ্টমনুজাং কালে মৃগপক্ষিমদাকুলাম্। ৫।১৪।৬,৮

অনতিদূরে হনুমান বিবিধাকারে ক্ষোদিত দীঘিকাশ্রেণী দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন। উহার সোপান পংক্তি পর্য্যায়ক্রমে বহুমূল্য রত্নদ্বারা নির্ম্মিত ছিল। আভ্যন্তরীণ কুট্টিম (গৃহতল) স্ফটিক প্রস্তরে নির্ম্মিত। সরোবর সলিল নির্ম্মল ; এবং মুক্তা, প্রবাল ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, দীর্ঘিকার তীরস্থ কনকময় বিচিত্র তরু শ্রেণী অদ্ভুত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘিকাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম শোভা পাইতেছিল এবং চক্রবাক ও হংস সারস প্রভৃতি পক্ষী কূজন করিতেছিল, শত শত লতাদল অবনমিত ছিল।

অনতিদূরে হনুমান মেঘতুল্য একটি সুরম্য পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। সেই পর্ব্বত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূটগৃহ (কপটগৃহ) ও শিলাগৃহে সুসজ্জিত ছিল। পার্শ্বদেশে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা; নদীর অপরতীরে বন মধ্যে একটি পথ সুশোভিত বিচিত্র সরোবর এবং বিবিধাকারে খোদিত স্বচ্ছসলিলা কৃত্রিম দীর্ঘিকা দেখিলেন।

রাবণের কূটগৃহ

দীর্ঘিকাগুলির সোপানশ্রেণী মণিময় মুক্তা খচিত, উহার চতুর্দ্দিকে সুবিশাল প্রাসাদ শ্রেণী বেষ্টিত। সর্ব্বত্র কৃত্রিম বন ও কাননশ্রেণী বিরাজিত ছিল। সেই রমণীয় উপবন নানা জাতীয় ফলপুষ্প শোভিত ছিল। ছত্রাকার গুল্ম শ্রেণী এবং কনকময় বেদিকা অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা করিয়াছিল। অদূরে শিশম্পা বৃক্ষ সুবিশাল ঘন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিরাজিত, বৃক্ষের শাখা প্রশাখাগুলি বেষ্টন করিয়া সূক্ষ্ম লতা-তন্তু দুলিতেছিল।

> বাপীশ্চ বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা।
> মহার্হৈর্মণিসোপানৈরুপপন্নাস্ততস্ততঃ ॥
> মুক্তাপ্রবালসিকতাঃ স্ফটিকান্তরকুট্টিমাঃ।
> কাঞ্চনৈস্তরুভিশ্চিত্রৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ ॥ ৫।১৪।২২-২৩

ইহাই ছিল রাক্ষসপতির অশোকবন। হনুমান গোপনভাবে শিশম্পা বৃক্ষ মধ্যে অবস্থান করিয়া জানকীর দর্শন আশায় ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ হনুমান অদূরে এক পাণ্ডুর বর্ণ অত্যুচ্চ প্রাসাদ অবলোকন করিলেন—সহস্র স্তম্ভোপরি গোলাকার,

লঙ্কার অশোকবন

সোপান পংক্তি প্রবাল খচিত। বেদিকা বিশুদ্ধ কাঞ্চনময়। হনুমান দূর হইতে নিরীক্ষণ করিলেন, ঐ প্রাসাদের মূলদেশে প্রতিপদ চন্দ্রলেখার ন্যায় ক্ষীণা, দুর্ব্বল কান্তি এক নারী বিষণ্ণচিত্তে বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন; তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজস্র ধারা বিনির্গত হইতেছিল। চতুর্দ্দিকে রাক্ষসী পরিবৃতা, ভীতা ব্যাকুল নারীকে দেখিয়া হনুমান যুক্তিবলে

স্থির করিলেন—ইনিই বোধ হয় অযোধ্যার রাজপুত্রবধূ মিথিলারাজ জনক-দুহিতা সীতা।

হিমহতনলিনীব নষ্টশোভা ব্যসনপরম্পরয়া নিপীড্যমানা।
সহচররহিতেব চক্রবাকী জনকসুতা কৃপণাং দশাং প্রপন্না ॥
অস্যা হি পুষ্পাবনতাগ্রশাখাঃ শোকং দৃঢ়ং বৈ জনয়ন্ত্যশোকাঃ।
হিমব্যপায়েন চ শীতরশ্মিরভ্যুত্থিতো নৈকসহস্ররশ্মিঃ ॥ ৫।১৬।৩০-৩১

হনুমান লঙ্কা দর্শন করিয়া সীতাদেবীর সন্ধান লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে উপনীত হইলেন।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে লঙ্কার দ্বার দুর্গ সৈন্য সংখ্যা, পরিখা, প্রাকার, এবং রাক্ষসদের বিষয় বিশদ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান সবিনয়ে উত্তর দিলেন—লঙ্কাপুরী দুর্গম, হস্তী-অশ্ব রথ সঙ্কুল লঙ্কাপুরী সুশিক্ষিত রাক্ষস সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত। লঙ্কায় চারিটি সিংহদ্বার আছে। সেই দ্বারের সন্ধিস্থল হইতে বাণ ও শিলাদি নিক্ষেপ করিবার জন্য বৃহৎ ইযুপল যন্ত্র স্থাপিত আছে। সেই ইষুপলের সাহায্যে শত্রুসৈন্যকে বহির্দ্দেশ হইতে প্রতিহত করা যায়। রাক্ষসগণ তথায় লৌহস্নারময়ী শলাকা এবং শত শত শতঘ্নী সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে অগাধ জলপূর্ণ পরিখা খনিত রহিয়াছে।

লঙ্কার রক্ষা ব্যবস্থা

প্রহৃষ্টমুদিতা লঙ্কা মত্তদ্বিপসমাকুলা।
মহতী রথসম্পূর্ণা রক্ষোগণনিষেবিতা ॥
বাজিভিশ্চ সুসম্পূর্ণা সা পুরী দুর্গমা পরৈঃ।
দৃঢ়বদ্ধকপাটানি মহাপরিঘবন্তি চ।
চত্বারি বিপুলান্যস্যা দ্বারাণি সুমহান্তি চ ॥
তত্রেষুপলযন্ত্রাণি বলবন্তি মহান্তি চ।
আগতং পরসৈন্যং তৈস্তত্র প্রতিনিবার্য্যতে ॥ ৬।৩।১০-১২

হনুমান সেতুরক্ষার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন—লঙ্কাপুরীর চারিটি দ্বারে পরিখা অতিক্রম করিবার জন্য চারিটি

সুপ্রশস্ত সেতু আছে। সেতুর নিকটে বহু প্রকার যন্ত্র ও বৃহদাকার গৃহশ্রেণী আছে, শত্রুসৈন্য উপস্থিত হইলে সেই সকল সেতুপথ প্রাচীরের উপরিভাগে স্থাপিত যন্ত্রাদি দ্বারা পরিচালিত হয়, যন্ত্রচালনা করিলে শত্রুসৈন্য পরিখার জলে পতিত হয়।

পরিখা

দ্বারেষু তাসাং চত্বারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ।
যন্ত্রৈরুপেতা বহুভির্মহদ্ভির্গৃহপঙক্তিভিঃ॥
ত্রায়ন্তে সংক্রমাস্তত্র পরসৈন্যাগমে সতি।
যন্ত্রৈস্তৈরবকীর্য্যন্তে পরিখাসু সমন্ততঃ॥ ৬৷৩৷১৬-১৭

এবার হনুমান লঙ্কার দুর্গ সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন—লঙ্কায় চারি প্রকার দুর্গ আছে—নাদেয়, পার্ব্বত্য, বন্য, কৃত্রিম; এই দুর্গগুলি এত সুদৃঢ় যে দেবগণও লঙ্কায় প্রবেশ করিতে ভীত হন। লঙ্কার জলদুর্গের সঙ্গে নৌকাদ্বারাও যোগাযোগের পথ নাই। এই জন্য আজ পর্য্যন্ত কেহ লঙ্কার হস্তী ও অশ্ব বাহিনীর সংবাদ অবগত নহে। পর্ব্বতের উপর অনেক দুর্গ আছে। সেই স্থান সুরক্ষিত। সুতরাং সেই দুর্গ দুর্জ্জয়। বন্য দুর্গগুলি অত্যন্ত ঘন বনানী দ্বারা পরিবৃত। দিনের আলো সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, বিশাল বৃক্ষরাজি দ্বারা বন্য দুর্গগুলি পরিরক্ষিত। কৃত্রিম দুর্গগুলি শত্রুকে বিভ্রান্ত করে।

লঙ্কায় চারি প্রকার দুর্গ

লঙ্কাপুরী নিরালম্বা দেবদুর্গাভয়াবহা।
নাদেয়ং পার্ব্বতং বন্যং কৃত্রিমঞ্চ চতুর্ব্বিধম্॥
স্থিতা পারে সমুদ্রস্য দূরপারস্য রাঘব।
নৌপথশ্চাপি নাস্ত্যত্র নিরুদ্দেশশ্চ সর্ব্বশঃ॥
শৈলাগ্রে রচিতা দুর্গা সা পূর্দ্দেবপুরোপমা।
বাজিবারণসম্পূর্ণা লঙ্কা পরমদুর্জ্জয়া॥ ৬৷৩৷২০-২২

তারপর হনুমান বলিলেন সৈন্য ব্যবস্থার কথা। লঙ্কাপুরীর পূর্ব্ব দ্বারে শূলহস্তে দুর্দ্ধর্ষ দশসহস্র রাক্ষস নিয়ত রক্ষাকার্য্যে

নিয়োজিত, দক্ষিণদ্বারে খড়্গাহস্তে লক্ষ রাক্ষস এবং চতুরঙ্গ উৎকৃষ্ট যোদ্ধা নিযুক্ত আছে। পশ্চিম দ্বারে খড়্গ ও বর্ম্মধারী সর্ব্বাস্ত্র কুশল দশলক্ষ রাক্ষস আছে। উত্তর দ্বারে দশকোটী রথী ও অশ্বারোহী নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহারা সদ্বংশজাত এবং রাজা কর্ত্তৃক সম্মানিত।

সৈন্য ব্যবস্থা

অযুতং রক্ষসামত্র পূর্ব্বদ্বারং সমাশ্রিতম্।
শূলহস্তা দুরাধর্ষাঃ সর্ব্বে খড়্গাগ্রযোধিনঃ ॥
নিযুতং রক্ষসামত্র দক্ষিণদ্বারমাশ্রিতম্।
চতুরঙ্গেণ সৈন্যেন যোধাস্তত্রাপ্যনুত্তমাঃ ॥
প্রযুতং রক্ষসামত্র পশ্চিমদ্বারমাশ্রিতম্।
চর্ম্মখড়্গধরাঃ সর্ব্বে তথা সর্ব্বাস্ত্রকোবিদাঃ ॥
অর্ব্বুদং রক্ষসামত্র উত্তরদ্বারমাশ্রিতম্।
রথিনশ্চাশ্ববাহাশ্চ কুলপুত্রাঃ সুপূজিতাঃ ॥ ৬।৩।২৪-২৭

লঙ্কার বর্ণনায় লঙ্কার অবস্থিতি, প্রাকার, পরিখা, সিংহদ্বার, পথ, একাধিক তল সমন্বিত প্রাসাদ, বন, উপবন, উদ্যান, প্রাসাদ কানন, রাজসভা, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পশু এবং পক্ষীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। লঙ্কার ঐশ্বর্য্য বর্ণনায় লঙ্কার ধনরত্ন মণিমুক্তা প্রাসাদ বিলাস সামগ্রী ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রাক্ষস সভ্যতা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাপারে অতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বাল্মীকি অযোধ্যার বর্ণনা অপেক্ষা লঙ্কার বর্ণনায় অধিকতর উচ্ছ্বসিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। এই সমস্ত অগ্রগতির মূলে রাক্ষস-রাজের উৎসাহ, রাক্ষসজাতির সৌন্দর্য্যবোধ, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য, শিল্পী ও শ্রমজীবিদের নিপুণতা ও নিষ্ঠা এবং বহু যুগ সঞ্চিত কর্ম্মধারার উৎকর্ষ সূচনা করে। সর্ব্বতোমুখী উন্নত রাক্ষস সভ্যতা একদিনে সম্ভব হয় নাই। এই উৎকর্ষলাভের পশ্চাতে অভিজ্ঞতা, স্থাপত্যজ্ঞান, যথা প্রয়োজন দ্রব্য সম্ভারের সমাবেশ ও প্রাচুর্য্য ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

রাক্ষসের রাষ্ট্রনীতি

সমাজ জীবনের পরিপূর্ণ পরিণতি রাষ্ট্রজীবনে। বাল্মীকি রাক্ষস সমাজের যে চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন, সেই চিত্রের মধ্যে রাক্ষস রাষ্ট্রের প্রায় পূর্ণাঙ্গরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। রাক্ষস রাষ্ট্রের কেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত দুস্তর তরঙ্গ সেবিতা, গিরি পরিরক্ষিতা, দুর্ভেদ্যা লঙ্কা নগরী।

রাবণের বৈদেশিক নীতিঃ—রাবণ লঙ্কায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া কালকেয় বংশীয় দানব বিদ্যুজিহ্বের সহিত ভগ্নী শূর্পণখার বিবাহ দিলেন, পরে স্বয়ং ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করেন, বিরোচন পুত্র বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালাকে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুষের দুহিতা ধর্ম্মপরায়ণা সরমার সহিত বিভীষণের বিবাহ হইল। এই সকল বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা রাবণের রাজনীতির একটা দিক সূচিত হয়। রাবণ বিভিন্ন রাজপরিবারের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। হিমালয় হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত তাঁহার আত্মীয় রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

রাবণের রাজ্যশাসনঃ—রাবণ স্বয়ং বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি দেবতা, মানব ও দানব শত্রুকে শাস্তি দিবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপী বিরাট অভিযান করিয়াছিলেন।

রাবণ স্বয়ং লঙ্কা শাসন করিতেন। সেখানে তিনি ছিলেন একরাট্। জনস্থানে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের গোদাবরী সেবিত দণ্ডকারণ্যে তাঁহার ভগ্নী শূর্পণখা শাসনকর্ত্রী ছিলেন। শূর্পণখাকে সাহায্য করিবার জন্য ছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি খর ও দূষণ এবং চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সেনা। উত্তর ভারতের তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র রামচন্দ্র কর্তৃক পরাজিত হইয়া মারীচ এই দণ্ডকারণ্যেই

অজিনচর্ম্ম পরিধান করিয়া নিরামিষভোজী হইয়া ব্রত তপশ্চর্য্যা করিতেন। ইহা ভিন্নও কয়েকটি মিত্ররাজ্য ছিল, যথা—মধুদৈত্যের রাজ্য। অবশ্য বালী, মান্ধাতা ও হৈহয়রাজ অর্জ্জুনের সঙ্গে বান্ধবতা ভিন্ন রাবণের রাজনৈতিক কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

ভারতের বিভিন্ন অংশে, যথা—উত্তর ভারতে মলদ, করুষ প্রভৃতি রাজ্যে রাক্ষসগণ বাস করিত। তাড়কা, মারীচ, সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসবীরগণ রাবণের ইঙ্গিতে ঋষিদের যজ্ঞ ভঙ্গ করিতেন। জনস্থানেও বহু ঋষি রাক্ষস রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিয়াছেন—আমাদিগকে রাক্ষস হস্ত হইতে রক্ষা করুন। আমরা রাক্ষস দ্বারা নিপীড়িত, নিহত ; আমাদের দুরবস্থা দর্শন করুন।

> ত্বনাথোঽনাথবদ্রাম রাক্ষসৈর্হন্যতে ভৃশম্ ॥
> এহি পশ্য শরীরাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। ৩।৬।১৫-১৬

বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে বিরাধ, কবন্ধ, অয়োমুখী প্রভৃতি রাক্ষসদের সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বস্তুতঃপক্ষে রাক্ষসের রাষ্ট্রজীবনের কেন্দ্র ছিল রাবণ শাসিত লঙ্কানগরী। এই নগরীর শাসন ব্যবস্থা হইতে রাক্ষসের রাষ্ট্রজীবনের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

লঙ্কার ভৌগোলিক অবস্থান রাজ্যরক্ষার পক্ষে এত বেশী সহায়ক ছিল যে রাবণ তাঁহার সীমান্ত রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। কারণ তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই যে বহিঃশত্রু দুস্তর সাগর অতিক্রম করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে। অবশ্য ইহা সত্য যে, মধুদৈত্য রাবণের অনুপস্থিতিতে কুম্ভীনসীকে লঙ্কাপুরী হইতে হরণ করিয়াছিলেন। রাবণের মত বিচক্ষণ রাজার পক্ষে এইরূপ নিঃশঙ্ক ভাব অবলম্বন করা গর্হিত। এমন কি রাবণ সীমান্ত সম্বন্ধে সংবাদের জন্য কোন চরও নিযুক্ত করেন নাই।

রাবণের অত্যাধিক আত্মবিশ্বাস

দণ্ডকারণ্যে অযোধ্যার রাজকুমারদ্বয়ের উপস্থিতি সম্বন্ধে শূর্পণখা অথবা খর-দূষণের রাবণকে অবহিত করা উচিৎ ছিল। এমন কি খর দূষণ এবং চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য নিহত হইতেছিল, এই সংবাদও লঙ্কাধিপতিকে প্রদান করা হয় নাই, ইহাও আশ্চর্য্য। অন্যদিকে রামচন্দ্র সেতুবন্ধন করিতেছিলেন। রাজ্যের অপর প্রান্তে অসংখ্য বানর সৈন্যের উপস্থিতি সম্বন্ধে রাবণ কোন সংবাদই জানিতেন না, ইহাও আশ্চর্য্য। তাহাতে মনে হয় যে, রাবণের আত্মবিশ্বাস এত বেশী ছিল যে তিনি গুপ্তচর নিযুক্তি অথবা সীমান্ত রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাই।

লঙ্কা রক্ষার ব্যবস্থা : পূর্ব্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, লঙ্কা নগরী রক্ষার ব্যবস্থা করিতে রাবণ কার্পণ্য করেন নাই। লঙ্কার দ্বার, দুর্গ, পরিখা, প্রাকার, সৈন্য সংখ্যা ও দুর্গ রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রসাদে সমুদ্রবেলা-বেষ্টনবদ্ধা লঙ্কাপুরী ছিল সততই দুর্গম। ইহার উপরেও লঙ্কানগরী প্রাচীর ও জলপূর্ণ গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। লঙ্কায় চারিটি সিংহদ্বার ছিল। সেই দ্বারের অভ্যন্তর হইতে বান ও শিলাদি নিক্ষেপের জন্য বৃহৎ ইষুপল যন্ত্র স্থাপিত ছিল। প্রাচীরের সংলগ্ন স্থানে লৌহসার-ময়ী শলাকা ও শত শত শতঘ্নী সুসজ্জিত ছিল। পরিখার উপরে যন্ত্রচালিত সেতু ছিল। যন্ত্র চালনা করিলে শত্রুসৈন্য পরিখার জলে পতিত হইত।

লঙ্কা রক্ষার জন্য চারি প্রকার দুর্গ ছিল—নাদেয় বা জলদুর্গ, পার্ব্বত্য দুর্গ, বন্য দুর্গ ও কৃত্রিম দুর্গ। জলদুর্গগুলির বিরাট জলাশয়ের অভ্যন্তরে স্থাপিত ছিল, তথায় কোন প্রকার যানবাহন গমনাগমনের সুযোগ ছিল না। সুতরাং ঐ দুর্গগুলি ছিল দুর্গম। পর্ব্বতের উপরেও অনেক দুর্গ ছিল। সেই দুর্গগুলি ছিল হস্তী এবং অশ্ব দ্বারা সুরক্ষিত। সেইজন্য এ দুর্গগুলি ছিল দুর্জ্জয়। বন্যদুর্গগুলি ছিল ঘন বনানী পরিবৃত। সেখানে

লঙ্কার দুর্গ

সূর্য্যের আলোও প্রবেশ করিতে পারিত না। ঐগুলি অন্ধকারের আবরণে আবৃত ছিল। কৃত্রিম দুর্গগুলি শত্রুকে বিভ্রান্ত করিত।

লঙ্কার প্রহরী

লঙ্কাপুরীর বিভিন্ন দ্বারে যথোচিত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত সহস্র সহস্র রাক্ষস নিয়ত প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। রাজা সাধারণতঃ সদবংশজাত রাক্ষসদিগকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন, এবং তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

শূর্পণখা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বিরূপিতা হইয়াছেন ; খর, দূষণ, ত্রিশিরা এবং চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য রাম কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং শূর্পণখা প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্যে ভ্রাতার নিকট লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মন্ত্রীমধ্যে সমাসীন-উত্তম বস্ত্র পরিহিত, দিব্যালঙ্কার ও মাল্যশোভিত। শূর্পণখা রাবণকে মন্ত্রী মধ্যে নিশ্চিন্ত সমাসীন দেখিয়া পরুষবাক্যে কহিলেন—"রাজা, তুমি

শূর্পণখার তিরস্কার

স্বেচ্ছাচারী, তুমি সুখভোগ মত্ত। তোমাকে সুপথে চালিত করিতে পারে, এমন মন্ত্রীও তোমার নাই। তোমার রাজ্যে বিষম ভয় উপস্থিত হইয়াছে, এই অবশ্য জ্ঞাতব্য ব্যাপার তুমি জানিতে পারিতেছ না। যে রাজা তুচ্ছ সুখভোগে মত্ত, স্বেচ্ছাচারী ও লোভী রাজাকে প্রজারা শ্মশান মধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় অবহেলা করে ; যে রাজা স্বয়ং রাজকার্য্য অনুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্যসহ বিনষ্ট হন। যিনি প্রমদা প্রভৃতি দ্বারা বশীভূত, যাঁহার দর্শন নিতান্ত দুর্ল্লভ, যিনি উত্তমরূপে চর নিযুক্ত করেন না, তাঁহাকে প্রজারা দূর হইতে পরিত্যাগ করে।

ততঃ শূর্পণখা দীনা রাবণং লোকরাবণম্।
অমাত্যমধ্যে সংক্রুদ্ধা পরুষং বাক্যমব্রবীৎ ॥
প্রমত্তঃ কামভোগেষু স্বৈরবৃত্তো নিরঙ্কুশঃ।
সমুৎপন্নং ভয়ং ঘোরং বোদ্ধব্যং নাববুধ্যসে ॥
সক্তং গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্।
লুব্ধং ন বহু মন্যন্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজাঃ। ৩।৩৩।১-৩

এইখানে শূর্পণখার বাক্যানুসারে দেখা যায়, রাক্ষসরাজের মন্ত্রী ছিল এবং রাজা মন্ত্রী নিযুক্ত করিতেন। রাজা স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন, না করিলে বিনষ্ট হইতেন। রাজা চর দ্বারা দূরস্থ অনর্থ প্রত্যক্ষ করেন। এইজন্য রাজা দীর্ঘচক্ষু বলিয়া অভিহিত হন।

যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থান্ সর্ব্বানর্থান্ নরাধিপাঃ।
চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানো দীর্ঘচক্ষুষঃ॥ ৩।৩৩।১০

শূর্পণখার উপস্থিতিতে মনে হয়, সকল শ্রেণীর নারী না হইলেও অন্ততঃ রাজপরিবারের নারীগণ রাজার মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত হইতে পারিতেন। রাক্ষসরাজ নীচবংশীয় অমাত্য নিযুক্ত করিয়াছেন; এই অভিযোগে শূর্পণখা রাবণকে নীচবংশীয় অমাত্য নিয়োগের জন্য তিরস্কার করিয়াছেন।—

"অযুক্তচারং মন্যে তাং প্রাকৃতৈঃ সচিবৈর্যুতম্। ৩।৩৩।১১

রাবণের রাজ্যে রাজা প্রজার সম্পর্কঃ—অল্পদাতা, তীক্ষ্ণ স্বভাব, প্রমত্ত, গর্ব্বিত, ভূপতি প্রজাবর্গের নিন্দনীয় এবং অবাঞ্ছিত। শূর্পণখা বলিলেন, "রাজ্যের সকল বিষয়েই অভিজ্ঞতা, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণতা রাজার বিশেষ গুণ; নীতিবান রাজা প্রজাবর্গের পূজ্য। যে রাজা প্রজার অবমাননাকারী, দেশকালপাত্র বিবেচনায় অসমর্থ, পরের দোষগুণ নির্ণয়ে চিত্তনিবেশ করিতে অপটু, সেই রাজা অচিরে বিপন্ন ও রাজ্যচ্যুত হন। রাজ্যের দূত রাজ্যের ভিত্তি স্বরূপ।"

এখানে দেখা যায়, রাবণের রাজ্যে প্রজা ও রাজার সঙ্গে একটা পারস্পরিক সম্মানসূচক সম্বন্ধ ছিল, প্রজা রাজাকে সম্মান করিতেন, রাজাও প্রজাকে সম্মান করিতেন। প্রজার অবমাননার ফলে রাজার পক্ষে রাজ্যচ্যুতি পর্য্যন্ত ঘটিতে পারিত।

তীক্ষ্ণমল্পপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্ব্বিতং শঠম্।
ব্যসনে সর্ব্বভূতানি নাভিধাবন্তি পার্থিবম্॥ ৩।৩৩।১৫

শূর্পণখার উক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যেন নীতির

বিচারে রাক্ষসের রাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটা সার্ব্বজনীন আদর্শ ছিল। রাজা রাজ্যশাসন করিতেন, এবং তিনি বহুগুণ সম্পন্ন, ন্যায়বান, নীতিবান, বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মকুশল হইতেন।

অভিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্।
ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনোঽপি নরাধিপম্॥ ৩.৩৩।১৬

রাবণের মন্ত্রী ও মন্ত্রণা সভা :—রাক্ষসরাজেরও মন্ত্রণাসভা ছিল এবং রাজা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হইলেও তিনি মন্ত্রী এবং সুহৃদগণের সহিত পরামর্শ করিতেন। রাবণের চারিজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—দুর্দ্ধর্ষ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব এবং নিকুম্ভ। মন্ত্রণাসভা রাজ-প্রাসাদ হইতে দূরে ছিল। রাবণ মন্ত্রণার উদ্দেশ্যে সুশিক্ষিত অশ্ববাহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সভাগৃহে আগমন করিতেন। রাক্ষসপতির অগ্রে সর্ব্বাস্ত্রধারী অসিচর্ম্ম শোভিত বহুসংখ্যক রাক্ষস-প্রহরী গমন করিত। অন্যান্য প্রহরিগণ পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিত। রাক্ষসরাজ রাবণ সভায় উপস্থিত হইলে তুর্য্যধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত করা হইত। রাক্ষসরাজের গমনের সময় রাজপথ সুশোভিত করা হইত। সভাগমনের সময় প্রজাবর্গ রাজার স্তুতিপাঠ করিত। তাহাতে বোঝা যায় যে, প্রতিদিন রাজা মন্ত্রণা-সভায় গমন করিতেন না। রাজার মন্ত্রণাসভা আহ্বান ও তথায় গমন একটি বিশেষ অনুষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইত।

সিংহাসনের উপরিভাগে মস্তকোপরি পাণ্ডুর বর্ণ ছত্র শোভা পাইত। বামে ও দক্ষিণে শুভ্রবর্ণ চামর দোলায়মান ছিল। এই সভাগৃহ বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ছয়শত স্বর্ণখচিত পট্টবস্ত্র পরিহিত পিশাচ দ্বারা সভাগৃহ রক্ষিত হইত। ইহা দ্বারা মনে হয় পিশাচ নামে একটি গোষ্ঠী ছিল।

রাবণ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া দূতগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা লঙ্কাবাসী রাক্ষসসচিবগণকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমার এক মহৎ সমস্যা সমুপস্থিত।"

এই সমস্ত বিবৃতি হইতে অনুমান করা যায় যে রাক্ষসরাজ অশ্ববাহিত রথে গমন করিতেন; অগ্র পশ্চাৎ দক্ষিণ এবং বামপার্শ্ব প্রহরী বেষ্টিত হইত। রাজভ্রমণ উপলক্ষে রাজপথ সুশোভিত করা হইত; মন্ত্রণাগৃহ রক্ষার জন্য ছয়শত প্রহরী উপস্থিত থাকিত; সুতরাং এই মন্ত্রণাসভার বিস্তার ও আয়তন সহজেই অনুমেয়।

মন্ত্রণাসভার রীতি

রাবণের আদেশ অনুসারে লঙ্কাবাসী রাক্ষস প্রধানগণ অচির-কালমধ্যে রথ, হস্তী, অশ্বে আরোহণ করিয়া অথবা পদব্রজে সভা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; রাক্ষসগণ রাজার পদবন্দনা করিলেন এবং রাজা কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইলেন। কেহ উন্নত আসনে, কেহ বিস্তৃত আসনে, কেহ ভূম্যাসনে উপবেশন করিলেন।

"রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বা তু রাজ্ঞা তে প্রতিপূজিতাঃ।
পীঠেষ্বন্যে বৃষীষ্বন্যে ভূমৌ কেচিদুপাবিশন্ ॥" ৬।১১।২৩

ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, রাক্ষস সমাজে পদবন্দনা করার রীতি ছিল এবং রাজাও প্রজাদিগকে প্রতিপূজা করিয়া সম্মানিত করিতেন। রাজসভায় পৃষ্ঠাসন, বিস্তৃতাসন বা ভূমি-আসন ছিল।

বিভীষণও এই মন্ত্রণাসভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রথ অশ্ববাহিত ছিল; সেই রথ মঙ্গলচিহ্ন সংযুক্ত ছিল। তিনি প্রথমেই নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া অগ্রজের পদবন্দনা করিলেন। তারপর শুক ও প্রহস্ত নামক দুইজন রাক্ষস সেনাপতি আত্মপরিচয় দিয়া রাজার পদবন্দনা করিলেন। রাজা তাহাদিগকে পৃথক পৃথক আসন গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন—

যযৌ যশস্বী বিভীষণঃ সংসদমগ্রজস্য ॥
স পূর্ব্বজায়াবরজঃ শশংস
নামাথ পশ্চাচ্চরণৌ ববন্দে।
শুকঃ প্রহস্তশ্চ তথৈব তেভ্যো
দদৌ যথার্হং পৃথগাসনানি চ। ৬।১১।২৬-২৮

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, প্রত্যেকেই রাক্ষসরাজের সভায় স্বীয় নাম উচ্চারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেন—রাজবন্দনা করিতেন। রাক্ষস প্রধানদের জন্য পৃথক পৃথক আসনেরও ব্যবস্থা ছিল। রাজসভায় উপনীত ব্যক্তিগত অগুরুচন্দনে ও পুষ্পমাল্য দ্বারা অভ্যর্থিত হইতেন।

তেষাং পরার্দ্ধ্যাগুরুচন্দনানাং
প্রস্রাঞ্চ গন্ধাঃ প্রববুঃ সমন্তাৎ ॥ ৬।১১।২৯

রাজার আদেশ সেনাপতি রাজপুরীর অন্তর্দ্দেশ ও বহির্ভাগে যথাবিধানে সৈন্য সন্নিবেশ পূর্ব্বক নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। রাবণ বলিলেন—"হে সুহৃদবর্গ! প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, হিত অহিত, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-জনিত কোন কষ্ট উপস্থিত হইলে তোমরাই তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সাহায্য করিয়াছ; পূর্ব্বে তোমরা মন্ত্রণা করিয়া আমার যে সকল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলে, সে সকল কার্য্য কখনো বিফল হয় নাই।

প্রিয়াপ্রিয়ে সুখে দুঃখে লাভালাভে হিতাহিতে।
ধর্ম্মকামার্থকৃচ্ছেষু যূয়মর্হথ বেদিতুম ॥
সর্ব্বকৃত্যানি যুষ্মাভিঃ সমারব্ধানি সর্ব্বদা।
মন্ত্রকর্ম্ম ন যুক্তানি ন জাতু বিফলানি মে ॥ ৬।১২।৭-৮

এই বাক্য হইতে ধারণা করা যায় যে, রাবণ প্রয়োজনানুযায়ী রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিতেন। এই পরামর্শ রাক্ষস রাষ্ট্রের নীতি ছিল।

অতএব রাবণ সীতাহরণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া রাক্ষস প্রধানদের নিকট পরামর্শ যাচ্ঞা করিলেন, উদ্দেশ্য সীতাকে প্রত্যর্পণ করিব না, দশরথ তনয়দ্বয়কে নিধন করিব।

প্রজার বাক্ স্বাধীনতা ঃ—মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন—"রাজন্! সীতাহরণরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের সহিত আপনার মন্ত্রণা করা উচিৎ ছিল। আমরা

ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিতাম। কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া সীতাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত অনুচিৎ কার্য্য হইয়াছে।”

যদা তু রামস্য সলক্ষ্মণস্য
প্রসহ্য সীতা খলু সা ইহাহৃতা।
সকৃৎসমীক্ষ্যৈব সুনিশ্চিতং তদা
ভজেত চিত্তং যমুনেব যামুনম্॥ ৬।১২।২৮

কুম্ভকর্ণের এই বাক্য দ্বারা প্রতীত হয় যে, রাবণের রাজসভায় প্রজাবর্গের অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণের অধিকার ছিল, অর্থাৎ তাঁহাদের বাক্ স্বাধীনতা ছিল। তারপর কুম্ভকর্ণ বলিলেন, “যে রাজা কর্ত্তব্য-বিষয়ে মন্ত্রণা স্থির করিয়া ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহাকে কদাপি পশ্চাৎ সন্তাপিত হইতে হয় না।”

ন্যায়েন রাজকার্য্যাণি যঃ করোতি দশানন।
ন স সন্তপ্যতে পশ্চান্নিশ্চিতার্থমতির্নৃপঃ॥ ৬।১২।৩০

যে রাজা প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য পরে করেন এবং পশ্চাৎ কর্ত্তব্য কার্য্য পূর্ব্বে সম্পন্ন করেন, তিনি রাজার নীতি ও অনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কুম্ভকর্ণ অনুযোগের উদ্দেশ ছিল এই যে, সীতাহরণের পূর্ব্বেই প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করা রাক্ষসরাজের কর্ত্তব্য ছিল। অর্থাৎ সীতাহরণ ব্যাপারটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। কারণ, অযোধ্যার রাজকুমার রামচন্দ্র শূর্পণখা শাসিত রাবণের রাজ্য জনস্থানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ ও বাস করিতেছিলেন; রামচন্দ্র রাক্ষসরাজের ভগ্নীকে অপমান করিয়াছেন, বিকৃতনাসা করিয়াছেন, রাবণের প্রতিনিধি খর দূষণকে হত্যা করিয়াছেন। রাবণ রামপত্নীকে হরণ করিয়া রামের অপরাধের শাস্তি দিয়াছেন। রাবণ মারীচের নিকটও সীতা হরণের পক্ষে এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। রাক্ষসরাজ যাহা করিয়াছেন তাহা অনুচিত—এইরূপ মন্তব্য কুম্ভকর্ণ করেন

সীতাহরণের যুক্তি

নাই। কিন্তু এই নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে রাক্ষসরাজের মন্ত্রণাসভার সহিত পরামর্শ করা উচিৎ ছিল; রাজা প্রথমেই কার্য্য করিবেন পরে পরামর্শ যাচ্ঞা করিবেন, এইরূপ আচারণ রাজনীতি অনুমোদন করে না।

যঃ পশ্চাৎ পূর্ব্বকার্য্যাণি কর্ম্মাণ্যভিচিকীর্ষতি।
পূর্ব্বঞ্চাপরকার্য্যাণি স ন বেদ নয়ানয়ৌ ॥ ৬।১২।৩২

কুম্ভকর্ণ রাজনীতি দিক দিয়া মহারাজ রাবণের কার্য্যের অনুমোদন না করিলেও প্রজারূপে রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তস্মাত্ত্বয়া সমারব্ধং কর্ম্ম হ্যপ্রতিমং পরৈঃ।
অহং সমীকরিষ্যামি হত্বা শত্রূংস্তবানঘ ॥ ৬।১২।৩৫

অর্থাৎ আপনি যদিও অনুচিত কার্য্য করিয়া শত্রুর সহিত সমরের আয়োজন করিয়াছেন, আমি শত্রুগণকে হত্যা করিয়া আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিব। এই উক্তি দ্বারা কুম্ভকর্ণ প্রত্যক্ষভাবে রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরোক্ষভাবে বিভীষণের আচরণের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিয়াছেন।

কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী—

প্রশ্নটি হইল এই যে কুম্ভকর্ণ রাজভক্তি এবং রাজধর্ম্ম ও জাতি-ধর্ম্মের অনুরোধে কার্য্যতঃ রাজকৃত অন্যায় সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু বিভীষণ ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অনুরোধে রাজধর্ম্ম ও জ্ঞাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বিভীষণ রাক্ষসরাজের সীতাহরণ অন্যায়কে সমর্থন করেন নাই; কুম্ভকর্ণ রাবণের অন্যায় জানিয়াও সীতাহরণের প্রশ্ন বাদ দিয়া রাজ্যের কল্যাণ ও রাজসম্মানের জন্য প্রজার কর্ত্তব্য ও জ্ঞাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।

মহাপার্শ্ব নামক একজন পার্শ্বচর বলিলেন—শত্রুর সঙ্গে ব্যবহারে সাম দান ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় নীতি-সম্মত হইলেও নীতিবিদগণ দুর্ব্বলকে দণ্ড নীতি অবলম্বনের পরামর্শ দেন ও প্রবল

পক্ষের জন্য দণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে উপদেশ দিলেন অর্থাৎ রাক্ষসরাজ রাবণ রামচন্দ্র অপেক্ষা প্রবলতর সুতরাং রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে রাবণ দণ্ডনীতি গ্রহণ করিবেন—যুদ্ধ করিয়া রামচন্দ্রকে দণ্ড দিবেন।

প্রতিষেধয়িতুং শক্তৌ সবজ্রমপি বজ্রিণম্ ॥
উপপ্রদানং সান্ত্বং বা ভেদং বা কুশলৈঃ কৃতম্।
সমতিক্রম্য দণ্ডেন সিদ্ধিমর্থেষু রোচয়ে ॥ ৬।১৩।৬-৭

পূর্ব্বে রাক্ষস কবন্ধ পার্থিব ব্যাপারে শত্রুর সহিত ব্যবহারে ছয় প্রকার নীতির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দৈবীভাব ও সমাশ্রয়। কবন্ধোঽব্রবীৎ—

শৃণু রাঘব তত্ত্বেন যথা সীতামবাপ্স্যসি ॥
রাম ষড়্যুক্তয়ো লোকে যাভিঃ সর্ব্বং বিমৃশ্যতে। ৩।৭২।৭-৮
(সন্ধি বিগ্রহ যানাসন দৈবীভাব শাঠ্য সমাশ্রয়ঃ)।

[সন্ধি=শত্রুর সঙ্গে ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঐক্য ; বিগ্রহ=বিবাদ ; যান=শত্রুর প্রতিকূল যাত্রা ; আসন=শত্রুপক্ষের দুর্গাদি অবরোধ করিয়া অবস্থান ; সমাশ্রয় =অপরের সাহায্য বা আশ্রয় গ্রহণ করা ; দৈবীভাব=বাহ্যত এক আচরণ, অভ্যন্তরে অন্য আচরণ ; শাঠ্য=শত্রুর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি।]

বিভীষণ কিন্তু রাবণকে প্রকাশ্য রাজসভায় সভাসদ ও সেনাপতি বর্গের সম্মুখে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন ; ইহাতে ইন্দ্রজিৎ তাঁহার খুল্লতাত বিভীষণকে পুলস্ত্য বংশের অযোগ্য সন্তান, ভীরু, কাপুরুষ আখ্যা দিয়া নিন্দা করিলেন। বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে বালক, বাচাল, অদূরদর্শী বলিয়া মন্তব্য করিলেন। চপল ইন্দ্রজিৎকে পরামর্শদানের নিমিত্ত আমন্ত্রণ করায় রাবণের পরামর্শদাতাদিগকে নিন্দা করিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বীর হইলেও অনভিজ্ঞ অপ্রাপ্ত বয়স্ককে মন্ত্রণাদানের জন্য আমন্ত্রণ করা বিধিসঙ্গত ছিল না। এই প্রকার নিন্দোক্তি ও পরামর্শের জন্য রাবণ বিভীষণকে জ্ঞাতিশত্রু বলিয়া অশ্রাব্য পরুষ ভাষায় ভৎর্সনা

করিলেন। রাবণ এখানে জ্ঞাতি চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন—"জ্ঞাতি চরিত্র আমি জানি, সর্ব্বকালেই জ্ঞাতিগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলেই অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ আনন্দিত হইয়া থাকে।"

জানামি শীলং জ্ঞাতীনাং সর্ব্বলোকেষু রাক্ষস।
হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা॥ ৬।১৬।৩

পরিশেষে রাবণ বলিলেন, "তুমি সহোদর বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছ, নচেৎ অন্য কেহ এইরূপ কথা বলিলে এই দণ্ডেই তাহাকে বধ করিতাম।" বিভীষণ উত্তর দিলেন ঃ—

স ত্বং ভ্রান্তোঽসি মে রাজন্ ব্রূহি মাং যদ্যদিচ্ছসি।
জ্যেষ্ঠো মান্যঃ পিতৃসমো ন চ ধর্ম্মপথে স্থিতঃ।
ইদং হি পরুষং বাক্যং ন ক্ষমাম্যগ্রজস্য তে॥ ৬।১৬।১৭

"মহারাজ আপনি ভ্রান্ত, সুতরাং যাহা ইচ্ছা বলিতেছেন। আপনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুতরাং পিতৃতুল্য, মাননীয়; কিন্তু আপনি অগ্রজ বলিয়া আপনার অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

রাজার আলোচনা

এই বাক্যের পরোক্ষ অর্থ এই যে, সাধারণ প্রজাবর্গের প্রতি যে বিধান রাজআত্মীয়-স্বজনের জন্য রাবণ সেইরূপ বিধান প্রয়োগ করেন নাই।

রাবণের মাতামহ মাল্যবান রাবণকে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীরামের সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "শত্রুকে অবজ্ঞা করিবে না, স্বয়ং শত্রু অপেক্ষা হীনবল অথবা সমানবল হইলেও সন্ধি করিবে। কিন্তু শত্রু অপেক্ষা প্রবল হইলে বিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য।"

হীয়মানেন কর্ত্তব্যো রাজ্ঞা সন্ধিঃ সমেন চ।
ন শত্রুমবমন্যেত জ্যায়ান্ কুর্ব্বীত বিগ্রহম্॥
তন্মহ্যং রোচতে সন্ধিঃ সহ রামেণ রাবণ।
যদর্থমভিযুক্তোঽসি সীতা তস্মৈ প্রদীয়তাম্॥ ৬।৩৫।৯-১০

সুতরাং মাল্যবান রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণের পরামর্শদান করিয়াছিলেন। বীর প্রহস্ত নিহত হইবার পরে রাবণ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু রাবণ শ্রীরামের বাণে আহত হইলেন। কুম্ভকর্ণ রাবণ সমীপে উপস্থিত হইলে রাবণ তাঁহার নিকট যুদ্ধের বিপর্য্যয় বিবৃত করিলেন এবং কুম্ভকর্ণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পূর্ব্বের স্থায় কুম্ভকর্ণ বলিলেন—

যঃ পশ্চাৎ পূর্ব্বকার্য্যাণি কুর্য্যাদৈশ্বর্য্যমাস্থিতঃ।
পূর্ব্বং চোত্তরকার্য্যাণি ন স বেদ নয়ানয়ৌ॥
দেশকালবিহীনানি কর্ম্মাণি বিপরীতবৎ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রযতেষ্বিব॥ ৬।৬৩।৫-৬

"যে ব্যক্তি অগ্রের কর্ত্তব্য সকল শেষে এবং শেষের কর্ত্তব্যগুলি অগ্রেই সম্পন্ন করেন, তিনি নীতি অ-নীতির কিছুই জানেন না। অসংস্কৃত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা বিফল হয়। সেইরূপ দেশ কাল বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে তাহা বিপরীত ফলপ্রসূ ও দোষবহ হয়।" কুম্ভকর্ণ পূর্ব্ববৎ রাবণকে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে পরামর্শ না করার জন্য অভিযোগ করিলেন। তারপর বলিলেন, "রাজা পাঁচ প্রকার মন্ত্রণা করিয়া থাকেন, যথা— আরম্ভোপায়, শত্রুর সম্পদ অনুসন্ধান, দেশকাল বিচার, বিপত্তি প্রতিকার এবং কার্য্যসিদ্ধির উপায়। রাজাকে কর্ত্তব্য বিষয়ের জন্য ক্ষয় বৃদ্ধি ও স্থিতি অবধারণ করিতে হয়; রাজা সাম দান ভেদ দণ্ড চিন্তা করেন, সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করেন এবং তারপর তিনি কার্য্য করেন। ইহাই যথার্থ রাজনীতি।"

ত্রয়াণাং পঞ্চধা যোগং কর্ম্মণাং যা প্রপশ্যতে।
সচিবৈঃ সময়ং কৃত্বা স সম্যগ্‌বর্ত্ততে পথি॥ ৬।৬৩।৭

কুম্ভকর্ণ আরও বলিলেন, "শত্রুকে অবহেলা করা উচিত নয়। আপনি শত্রুকে অবহেলা করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই, সুতরাং আপনার বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে, আপনি স্বস্থানচ্যুতও হইতে পারেন। প্রকৃত রাজনীতি আপনি লঙ্ঘন করিয়াছেন।"

যো হি শত্রুমবজ্ঞায় আত্মানং নাভিরক্ষতি।
অবাপ্নোতি হি সোঽনর্থান্ স্থানাচ্চ ব্যবরোপ্যতে॥ ৬।৬৩।১০

তারপর বলিলেন, "আপনি শত্রুর দ্রব্য সম্পদ চিন্তা করেন নাই, অর্থাৎ বানরকুল যে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া রামচন্দ্রের সহায়তা করিতে পারে, তাহা চিন্তা করেন নাই। দেশ কাল বিবেচনা করেন নাই, কারণ পূর্ব্বে আপনি বিদেশে অভিযান করিয়া রাজ্য জয় করিয়াছেন। আপনার দেশ আক্রমণ কেহ করে নাই, আপনি সাগরবেলা বেষ্টনবদ্ধা লঙ্কা অ-লব্ধা বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। এবার দেখিলেন, আপনার অনুমান যথার্থ নহে। বিপত্তি প্রতিকারের জন্য আপনি উপায় চিন্তা করেন নাই। প্রথমতঃ বিপত্তি যে কোন দিক হইতে আসিতে পারে, তাহা ও বিবেচনা করেন নাই। নিজের শৌর্য্যবলে আপনি মানুষকে চিরকাল অবজ্ঞা করিয়াছেন। ব্রহ্মার বরদানের সময় মানবকে 'তৃণায় মন্যে' বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছেন। মানব হইতে আগত বিপদ প্রতিকারের উপায় চিন্তা করেন নাই।

রাজনীতি

"পরিশেষে কার্য্যসিদ্ধির জন্য একমাত্র দণ্ডনীতি বা যুদ্ধনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আরও ত্রিবিধ উপায় অবলম্বনে আপনি অপারগ হইয়াছেন।"

কুম্ভকর্ণ সর্ব্বশেষে বলিলেন, "আপনার প্রিয় পত্নী মন্দোদরী এবং অনুজ ভ্রাতা বিভীষণ হিতবাক্য বলিয়াছেন। এখন যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।"

যদুক্তমিহ তে পূর্ব্বং প্রিয়য়া মেঽনুজেন চ।
তদেব নো হিতং বাক্যং যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬।৬৩।২১

এখানে কুম্ভকর্ণ সম্পূর্ণ ভাবে রাজার ইচ্ছার উপর যথেচ্ছ কর্ত্তব্য নিরূপণের ভার দিয়াছেন। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেও কুম্ভকর্ণ রাবণের কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছেন, নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু রাজার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। এখানে কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের

রাজনীতি ও আচরণের পার্থক্য লক্ষনীয়। কর্ত্তব্য নিরূপণে মানব ধর্ম্ম অপেক্ষা রাজধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কিনা তাহা বিবেচ্য। কুম্ভকর্ণ রাজধর্ম্মের উপর এবং বিভীষণ মানবের ধর্ম্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

দূতের প্রতি ব্যবহার ঃ—রাক্ষসের রাজধর্ম্মে দূত অবধ্য। কিন্তু রাবণ কুবের প্রেরিত দূতকে স্বয়ং বধ করিয়াছিলেন। বন্দী হনুমানকে অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগে বধ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু বিভীষণ নিবেদন করিলেন, "দূত অবধ্য"।

বধং ন কুর্ব্বন্তি পরাবরজ্ঞাঃ
দূতস্য সন্তো বসুধাধিপেন্দ্রাঃ ॥
রাজন্ ধর্ম্মবিরুদ্ধঞ্চ লোকবৃত্তেশ্চ গর্হিতম্। ৫।৫২।৫-৬

রাবণ বলিলেন, "পাপীকে বধ করিলে পাপ হয় না। এই বানর রাজদ্রোহ অপরাধে পাপী, সুতরাং তাহাকে বধ করিলে পাপ নাই; অতএব আমি ইহাকে বধ করিব।"

ন পাপীনাং বধে পাপং বিদ্যতে শত্রুসূদন।
তস্মাদিমং বধিষ্যামি বানরং পাপকারিণম্ ॥ ৫।৫২।১১

বিভীষণ এই নীতি সমর্থন না করিয়া বলিলেন, "দূত সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে অবধ্য। দূত অপকর্ম্ম করিলে অপরাধের বহুপ্রকার দণ্ডের বিধান আছে, যথা—অঙ্গ বিরূপণ, মস্তক মুণ্ডন, কশাঘাত কিংবা দেহে অপমান সূচক কোন স্থায়ী চিহ্ন অর্পণ। কিন্তু দূতকে বধ করা দূরে থাকুক, বধের উল্লেখও আমি কখনও শুনি নাই।" শেষ পর্য্যন্ত হনুমানের শরীরে স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কনের বিধান হইল। তাঁহার লাঙ্গুলে অগ্নি সংযোগ করা হইল।

অন্যদিকে রাবণের প্রেরিত দূত শুক ও সারণ ধৃত হইয়া রামের সম্মুখে আনীত হইলে রামচন্দ্র তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান না করিয়া বানর সৈন্যদের মধ্যে যথেচ্ছ সংবাদ গ্রহণের সুযোগ দিয়াছিলেন।

যোঽন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূয়াদ্বাক্যমেতন্নিশাচর।
অস্মিন্মুহূর্ত্তে ন ভবেৎ ত্বাং তু ধিক্ কুলপাংসন ॥ ৬।১৬।১৬

স্ত্রীবধ অশাস্ত্রীয়ঃ—রাবণ ক্রমাগত পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হইয়া পরাজয়ের মূল সীতাদেবীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী সুপার্শ্ব বলিলেন, "মহারাজ স্ত্রীবধ পাপ করিবেন না।" ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় রাবণের রাষ্ট্রে স্ত্রীবধ গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত।

এই কয়েকটি ঘটনা হইতে মনে হয় যে, রাক্ষসের বিচার বিধিও মানবীয় ছিল। রাক্ষসের রাজনীতি শুক্র নীতিরই অনুরূপ ছিল।

রাবণের রাজ্যের পরিণতিঃ—রাবণের রাজ্য মাতামহের সম্পত্তি। ঐ রাজ্য এক পুরুষের রাজ্য। রাবণের পর তাঁহার কোন পুত্র রাজপদ লাভ করেন নাই। রাম কর্ত্তৃক বিজিত রাজ্য লঙ্কা বিভীষণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। রাম রাবণের পরে রাক্ষসকুল প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, ভরতের পুত্রের দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে অভিযানের সময় বহু রাক্ষস শোণিত লোভে তাঁহার সৈন্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল এবং লবণ রাক্ষসের সহিত একবার লক্ষ্মণ-পুত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।

উপসংহারে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, রাক্ষসের সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র ছিল। এই রাষ্ট্র একতান্ত্রিক ছিল। রাবণের মন্ত্রণাসভা

উপসংহার

পরামর্শমূলক ছিল। রাক্ষস রাষ্ট্রে পুরোহিতের কোন উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল না। রাজা স্বয়ং শাসক, বিচারক এবং সৈন্য পরিচালক ছিলেন। তাঁহার শাসনে প্রজাকুল সন্তুষ্ট ছিল। নানা দুর্দ্দৈব সত্ত্বেও রাবণের রাষ্ট্রে কোন বিপ্লবের বা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত মাত্রও পাওয়া যায় না। ভোগ জীবনের লক্ষ্য হইলেও রাষ্ট্রে একটা ধর্ম্মীয় ভাব ছিল এবং ব্যক্তিগত জীবনের মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। রাবণের মৃত্যুশয্যায় বিভীষণ ও মন্দোদরীর বিলাপের অন্তরালে, রামের সঙ্গে রাবণের কথোপকথনের মাধ্যমে রাক্ষস রাষ্ট্রের তথা রাক্ষস সমাজের জীবন দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাক্ষসের সমাজ জীবন

রাক্ষসগণ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করিত। রাক্ষস সমাজে বিভিন্ন বংশ ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—আদি পুরুষের নামানুসারে তাহাদের নামকরণ হইত—যথা :পুলস্ত্য ঋষির বংশধর পৌলস্ত্যেয়, অগস্ত্য মুনির বংশধর অগস্ত্য, বিশ্বামিত্রের বংশধর বৈশ্বামিত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে আদিমাতার নাম হইতে রাক্ষস সমাজের নামকরণ করা হইয়াছে ; যথা—ব্রহ্মধান, জাতুধান। তাহাদের আদিমাতা ছিলেন পিশাচিনী। রাবণ স্বয়ং ব্রহ্মধান (?) সম্প্রদায়ভুক্ত রাক্ষস ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতামহ :সুমালী শালকটঙ্কট গোষ্ঠীয় রাক্ষস ছিলেন। রামায়ণে আস্তিক এবং রুচির নামধেয় রাক্ষসের উল্লেখও পাওয়া যায়। বোধ হয়, এই দুই গোষ্ঠী তাহাদের বিশেষ গুণ অনুসারে নামকৃত হইয়াছে। আস্তিকগণ সৎস্বভাব এবং যাগযজ্ঞ শীল, বিশ্বাসী, ধর্ম্মপরায়ণ রাক্ষস ছিল। রুচিরগণ মিষ্টভাষী রুচি-সম্পন্ন রাক্ষস ছিল। ত্রিজটা, বিভীষণ, অবিন্ধ্য প্রভৃতি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন রাক্ষস ছিল। কিন্নরজাতীয় রাক্ষসেরও উল্লেখ আছে।

রাক্ষসের সমাজ সংগঠন

দেবতাভেদে কিম্বা উপাস্যভেদে রাক্ষস সমাজে কোন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই। রাবণ অবশ্য শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন, সুতরাং তিনি শিবের উপাসক ছিলেন ; কিন্তু রাবণের সম্পর্কে শৈব উপাধির উল্লেখ নাই। শৈব হইলেও ব্রহ্মার উপাসনায় কোন বাধা ছিল না। রাবণ ব্রহ্মার অনুগ্রহে লব্ধবর হইয়াছিলেন। রাবণের ভগ্নিপতি মধু দৈত্যও শিব উপাসনা করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ অষ্টযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অগ্নি, যম, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতা রাবণের শত্রু হইলেও রাবণপুত্র মেঘনাদ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। রাক্ষস সমাজে কর্ম্মানুসারে জাতিভেদ ছিল কিনা

উপাস্যভেদে সমাজ

জানা যায় না। রাক্ষসের শিল্পবিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, রাক্ষসসম্পর্কে নানাপ্রকার শিল্পীগোষ্ঠী ছিল। কিন্তু বৈশ্যজাতির কোন উল্লেখ নাই; কিঙ্কর ছিল, কিন্তু শূদ্রের উল্লেখ নাই।

রাক্ষসদের সামাজিক আচার ব্যবহার মানুষের মতনই ছিল। মাতৃভক্তি, গুরুসেবা, আচার্য্যসেবা, বৃদ্ধদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, সৎজীবন যাপন তাহাদের সমাজ জীবনের অঙ্গ ছিল এবং ইহা দ্বারা শুভফল লাভ সম্ভব বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। রাবণ তাঁহার পারিষদবর্গকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা আচার্য্য, গুরু, এবং বৃদ্ধগণকে বৃথাই সেবা করিয়াছ, কারণ তোমরা রাজধর্ম্মের অনুজীবী ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে পার নাই।"

সামাজিক আদর্শ

আচার্য্যো গুরবো বৃদ্ধা বৃথা বাং পর্য্যুপাসিতাঃ।
সাবং যদ্রাজশাস্ত্রাণামনুজীব্যং ন গৃহ্যতে॥ ৬।২৯।৯

রাবণের মাতৃভক্তির উল্লেখ রামায়ণে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। সপত্নীপুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া কৈকসী স্বীয় পুত্র রাবণকে ঐশ্বর্য্যে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের সমতুল্য অথবা কুবেরকে অতিক্রম করিবার আদেশ দিলেন। রাবণ মাতার নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে দশ সহস্র বৎসর গৌকর্ণ আশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন।

রাবণের মাতৃভক্তি

চিকীর্ষুর্দুষ্করং কর্ম্ম তপসে ধৃতমানসঃ॥
প্রাপ্স্যামি তপসা কামামতি কৃত্বাধ্যবস্য চ।
আগচ্ছদাত্মসিদ্ধ্যর্থং গোকর্ণস্যাশ্রমং শুভম্॥ ৭।৯।৪৬-৪৭

ভ্রাতৃভক্তির উদাহরণস্বরূপ কুম্ভকর্ণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুম্ভকর্ণ স্বভাবতঃ প্রগল্‌ভ ছিলেন। তিনি সচ্চরিত্র, সাধক, তপস্বী ছিলেন। তিনি রাবণের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা অনেক স্থলেই করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজের আদর্শের জন্য ভ্রাতৃধর্ম্ম বিসর্জ্জন করেন নাই এবং ভ্রাতার অন্যায়কে

কুম্ভকর্ণের ভ্রাতৃভক্তি

সমর্থন করেন নাই। রাজসভায় ভ্রাতার অনুমতি ব্যতীত কখনও তিনি আসন গ্রহণ করেন নাই। তিনি জ্যেষ্ঠ রাবণকে প্রদক্ষিণ, আলিঙ্গন ও প্রণাম করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।

ভ্রাতরং সম্পরিষ্বজ্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
প্রণম্য শিরসা তস্মৈ প্রতস্থে স মহাবলঃ ॥ ৬।৬৫।৩২

ভ্রাতাকে প্রণাম করিবার পূর্ব্বে কুম্ভকর্ণ স্নান করিয়া শুদ্ধদেহ হইয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রায় দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। রাবণও তাঁহার ভ্রাতাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং কোন শুভ কার্য্যের পূর্ব্বে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে রাবণ স্বয়ং নিজের গলদেশে শোভিত মাল্য কুম্ভকর্ণের গলদেশে বিলম্বিত করিয়াছিলেন।

দিব্যানি চ সুগন্ধীনি মাল্যদামানি রাবণঃ।
গাত্রেষু সজ্জয়ামাস শ্রোত্রয়োশ্চাস্য কুণ্ডলে।। ৬।৬৫।২৭

সুতরাং দেখা যায় যে, রাক্ষসদের সামাজিক আচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম, পাদবন্দনা, প্রদক্ষিণ, আলিঙ্গন ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠিত হইত।

রাবণও একদা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রহস্ত রাবণকে কুবেরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া লঙ্কাগ্রহণের পরামর্শ দিলে রাবণ বলিয়াছিলেন, "কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহার প্রতি বিরূপ আচরণ করা আমার পক্ষে সমীচীন নহে।" অবশ্য পরে কুবেরের কার্য্যে ব্যথিত ও দূতের অশোভন কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কুবেরের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন।

বিভীষণ তাঁহার আদর্শ এবং জীবনদৃষ্টির পার্থক্য সত্ত্বেও রাবণকে শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তিনিও রাবণের পাদ-বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালে নিজের আদর্শের জন্য নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। এই বিভীষণই শেষ পর্য্যন্ত রাবণের সৎকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

কুম্ভকর্ণের ও বিভীষণের আদর্শের পার্থক্য

রাবণের ভগ্নী প্রীতিও যথেষ্ট ছিল। যুদ্ধের উন্মাদনায় শূর্পণখার স্বামী কালকেয় দানব বিদ্যুজ্জীহ্বকে হত্যা করিলেও রাবণ শূর্পণখাকে জনস্থানের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই শূর্পণখার প্ররোচনাতেই রাবণ সীতা হরণ করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ের পরে লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতৃস্বসা ভগ্নী কুম্ভীনসীর অপহরণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধক্লান্ত রাবণ বিশ্রাম না করিয়া তৎক্ষণাৎ মধুদৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, রাবণের আত্মীয়-স্বজন প্রীতি শ্লাঘনীয় ছিল। রাক্ষস-সমাজে ভ্রাতা, ভগ্নী ও পরিবার-বর্গের প্রতি পরস্পর প্রীতি, স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির বন্ধন ছিল।

রাবণের ভগ্নীপ্রীতি

শূর্পণখার হস্তে জনস্থানের শাসনসভার অর্পণ করিয়া রাবণ প্রমাণ করিলেন যে, রাক্ষসনারীগণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন এবং তাঁহাদের রাজসভায় প্রবেশ নিষেধ ছিল না। তাড়কা রাক্ষসীও রাজ্যশাসন করিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শূর্পণখা যুদ্ধ করেন নাই।

রাক্ষসের বন্ধুত্ব যে রাক্ষস সমাজে কেবল যুদ্ধবিগ্রহ, বিবাদ বিসম্বাদই ছিল, তাহা নহে। রাবণের জীবনে বন্ধুত্ব এবং সখ্যেরও স্থান ছিল। রাবণ জীবনে পাঁচবার বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন—

রাবণের বন্ধুত্ব

(১) নিবাত কবচদিগের সঙ্গে
(২) মধুদৈত্যের সঙ্গে
(৩) হৈহয়রাজ অর্জ্জুনের সঙ্গে
(৪) কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর সঙ্গে
(৫) মান্ধাতার সঙ্গে।

বন্ধুত্বের আদর্শ ছিল স্বার্থসমতা, ধনধান্য প্রভৃতি সমস্ত উপভোগ্য পদার্থ বন্ধুগণ অবিভক্ত ভাবে ভোগ করিতেন।

তারপর বন্ধুগণ পরস্পরের গৃহে বাস করিতেন। রাবণ বন্ধুত্বের

পরে নিবাতকবচদিগের গৃহে বৎসরাধিককাল বাস করিয়াছিলেন। বন্ধুগণ পরস্পরকে স্বীয় বিদ্যা কলা ইত্যাদি দান করিতেন, যথা—রাবণকে নিবাতকবচগণ একশত মায়া শিক্ষা দিয়াছিল।

অর্চ্চিতস্তৈর্যথান্যায়ং সংবৎসরমথোষিতঃ।
স্বপুরান্নির্বিশেষঞ্চ প্রিয়ং প্রাপ্তো দশাননঃ ॥
তত্রোপধার্য্য মায়ানাং শতমেকং সমাপ্তবান্। ৭।২৩।১৫-১৬

মধুদৈত্য রাবণকে ধর্ম্মানুসারে পূজা করিয়াছিলেন, কারণ মধুদৈত্য রাবণের মাতৃম্বসা ভগ্নী হরণ করিয়া বিবাহ করিলেও রাবণ তাঁহার প্রতি শ্বশুরের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন। বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপে রাবণ মধুদৈত্যের গৃহে একরাত্রি বাস করিয়াছিলেন।

হৈহয়রাজ অর্জ্জুনের নিকট রাবণ পরাজিত ও বন্দী হইলে, রাবণের পিতামহ পুলস্ত্য ঋষি সুরলোক হইতে মাহিষ্মতী নগরে উপস্থিত হইয়া রাবণের মুক্তির জন্য অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং অগ্নিসাক্ষী করিয়া হিংসা-বিহীন বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ দিব্য আভরণ, মাল্য, চন্দন ইত্যাদি দ্রব্য উপহার দিলেন।

স তং প্রমুচ্য ত্রিদশারিমর্জ্জুনঃ
প্রপূজ্য দিব্যাভরণস্রগম্বরৈঃ।
অহিংসকং সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকং
প্রণম্য তং ব্রহ্মসুতং গৃহং যযৌ ॥ ৭।৩৮।১৮

বানররাজ বালী যুদ্ধার্থী রাবণকে পরাজিত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রাবণকে মুক্ত করিলে রাবণ বালীর সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া বন্ধুত্ব যাচ্ঞা করিলেন; এবং তিনি বলিলেন যে, "আমাদের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাজ্য, আচ্ছাদন, ভোজন অবিভক্ত হইবে।" পরে রাক্ষস এবং বানররাজ আলিঙ্গন করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন।

অবশেষে হস্তধারণ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাবণ প্রস্তাব করিলেন,

ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ ॥
দারাঃ পুত্রাঃ পুরং রাষ্ট্রং ভোগাচ্ছাদনভাজনম্।
সর্ব্বমেবাবিভক্তং নৌ ভবিষ্যতি হরীশ্বর ॥
ততঃ প্রজ্বালয়িত্বাগ্নিং তাবুভৌ হরিরাক্ষসৌ।
ভ্রাতৃত্বমুপসম্পন্নৌ পরিষ্বজ্য পরস্পরম্ ॥
অন্যোন্যং লম্বিতকরৌ ততস্তৌ হরিরাক্ষসৌ।
কিষ্কিন্ধ্যাং বিশতুর্হৃষ্টৌ সিংহৌ গিরিগুহামিব ॥ ৭।৩৭।৪০-৪৩

বানর ও রাক্ষস সমাজে অগ্নিদেবতা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, কারণ বিবাহ ও বন্ধুত্বের অনুষ্ঠান অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া সমাপ্ত হইত। হস্তধারণ, আলিঙ্গন বন্ধুত্বের অঙ্গ ছিল।

রাক্ষস সমাজে সৎকার, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, বন্ধুত্ব, হোম, যজ্ঞ, প্রভৃতি কার্য্যে অগ্নি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

রাক্ষস সমাজে নারীর স্থান ঃ—রামায়ণে কয়েকটি রাক্ষস নারীর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়—কৈকসী, তাড়কা, অজামুখী, সুরমা, সিংহিকা, অয়োমুখী, শূর্পণখা, কুম্ভীনসী, মন্দোদরী, সরমা, বজ্রজ্বালা, ত্রিজটা প্রভৃতি। তাড়কা ছিলেন সাপভ্রষ্টা যক্ষিণী। রাক্ষসী তাড়কা রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহার পুত্র মারীচ মহাতপস্বী ছিলেন। রাক্ষসী ছিল গর্ভমাত্রই সন্তান প্রসবিণী,—কৈকসী ছিলেন ঈর্যাপরায়ণা। অয়োমুখী ছিলেন অত্যন্ত কামুকী। শূর্পণখা ছিলেন কামুকী, প্রতিহিংসাপরায়ণা। তাঁহার দেহজ কামনার পশ্চাতে প্রীতি বা প্রেমের কোন স্থান ছিল না। রাম শূর্পণখার কাম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিলে শূর্পণখা লক্ষ্মণের নিকট কাম প্রস্তাব করিলেন। রাবণের রাজসভায় শূর্পণখা রাবণকে সীতাহরণের জন্য প্রলুব্ধ করিলেন। সেই সময় তিনটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ রামচন্দ্র রাবণের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া অপরাধ করিয়াছেন, রাক্ষস সৈন্য নিহত করিয়াছেন, সুতরাং রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ রাক্ষসরাজের কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছেন, রাজভগ্নীর অপমান

করিয়াছেন, সুতরাং রাজপরিবারের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা রাক্ষসরাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূর্পণখার তিরস্কারের অন্তরালে যথেষ্ট রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ শূর্পণখা সীতার রূপ বর্ণনা করিয়া রাবণকে সীতাহরণে প্রলুব্ধ করিলেন। শূর্পণখা তাঁহার ভ্রাতা রাবণের কামপ্রবৃত্তির বিষয় অবগত ছিলেন। শূর্পণখা যে ভাবে রাবণের নিকট সীতাহরণের যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যৌন ব্যাপারে রাক্ষসসমাজে আচার নিয়ম শ্লথ ছিল। অন্য দিকে মারীচ রাবণকে সীতাহরণ হইতে বিরত করার জন্য বলিয়াছিলেন, "রাবণ! বলপূর্ব্বক পরদারগমন অপেক্ষা মহাপাতক আর নাই।"

শূর্পণখার রাজনীতিজ্ঞান

পরদারাভিমর্ষাত্তু নান্যৎ পাপতরং মহৎ। ৩।৩৮।৩০

রাক্ষস সমাজে পরনারী ধর্ষণ সম্বন্ধে দুইপ্রকার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাক্ষস সমাজে কামপ্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। সীতাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য রাবণ সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, "বলপূর্ব্বক পরপত্নী হরণ বা পরস্ত্রী-গমন রাক্ষসের স্বধর্ম্ম।"

রাক্ষসের কামাসক্তি

স্বধর্ম্মো রক্ষসাং ভীরু সর্ব্বদৈব ন সংশয়ঃ।
গমনং বা পরস্ত্রীণাং হরণং সম্প্রমথ্য বা॥ ৫।২০।৫

রাবণের কামাসক্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার উক্তি লিপিবদ্ধ আছে। রাবণ অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলা ও অপ্সরা রম্ভাকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিয়াছেন। কামার্থ রাবণ ঋষি-কন্যা বেদবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া অপমান করিয়াছেন। পুঞ্জিকাস্থলা ব্রহ্মার নিকট রাবণের দুষ্কর্ম্মের কাহিনী নিবেদন করিলে ব্রহ্মা রাবণকে অভিশাপ দিলেন, "তুমি যদি অদ্য হইতে কোন নারীকে বলপূর্ব্বক সম্ভোগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তদ্দণ্ডেই তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।"

অদ্যপ্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি।
তদা তে শতধা মূর্দ্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৬।১৩।১৪

কুশধ্বজ ঋষির মহাতপস্বিনী কন্যা বেদবতীকে কামপ্রস্তাব করিয়া রাবণ তাঁহার কেশস্পর্শ করিয়াছিলেন। অপমানিতা বেদবতী অনলে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে রাবণকে বলিলেন যে, তিনি অয়োনিজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন এবং রাবণ বধের হেতু হইবেন। পরবর্ত্তিকালে এই বেদবতীই জনক রাজার গৃহে অযোনিজা জন্মগ্রহণ করিয়া সীতারূপে রাবণবধের কারণ হইয়াছিলেন।

যস্মাত্তু ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে।
তস্মাত্তব বধার্থং হি সমুৎপৎস্যত্যহং পুনঃ॥
...   .
তস্মাত্ত্বযোনিজা সাধ্বী ভবেয়ং ধর্ম্মিণঃ সুতা॥ ৭।১৭।৩১-:৩

রাবণ নলকুবেরের নিকট প্রতিশ্রুতা রম্ভাকে ধর্ষণ করিলে নলকুবের অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যদি রাবণ কখনো অকামা নারীকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করেন, তবে তাহার মস্তক তখনই সপ্তধা বিচূর্ণ হইবে।

যদা হ্যকামাং কামার্ত্তো ধর্ষয়িষ্যতি যোষিতম্॥
মূর্দ্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলীভবিতা তদা। ৭।৩১।৫৫-৫৬

কামুকতা রাবণের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হইলেও কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণের কামাসক্তির সমর্থন করেন নাই। হনুমান রাবণের অন্তঃপুরের নৈশচিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে পানমোহিতা, পানাসক্তা, শ্লথ-বসনা, রতিক্লান্তা নারীর চিত্র অত্যন্ত সজীব। এই চিত্র হইতে অনুমান করা যায় যে, রাক্ষস সমাজে নারী পুরুষের ভোগ ও বিলাসের সামগ্রী ছিল।

রাক্ষস নারীগণ মদ্যপান ও অক্ষক্রীড়া করিতেন; মদ্যপান রাক্ষস নারীদের অন্যতম প্রিয় ব্যসন ছিল। হনুমান মদ্যপানরতা নারী রাক্ষস অন্তঃপুরে দেখিয়াছিলেন।

স্তেবাং স্ত্রিয়স্তত্র মহানুভাবাঃ।
প্রিয়েষু পানেষু চ শক্তভাবাঃ
দদর্শ তারা ইব সুস্বভাবাঃ॥ ৫।৫।১৯

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নারীগণ মদ্যপান করিয়া নৃত্য করিতেন। অজামুখী রাক্ষসী ভয় প্রদর্শনের জন্য সীতাকে হত্যা করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণের প্রস্তাব করিলেন। শূর্পণখা বলিয়াছিলেন, "যাহা পান করিলে সকল শোক দূর হয় তোমরা অবিলম্বে সেই সুরা আনয়ন কর। আমরা নরমাংস আস্বাদন করিয়া নিকুম্ভিলায় গিয়া নৃত্য করিব।"

নারীর ব্যসন

সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রং সর্ব্বশোকবিনাশিনী।
মানুষং মাংসমাস্বাদ্য নৃত্যামোঽথ নিকুম্ভিলাম্॥ ৫।২৪।৪৬

সীতার অন্বেষণে হনুমান সমস্ত রাক্ষসপুরী ভ্রমণ করিয়া নারীদের নৃত্যগীত, বাদ্য, সুরতকেলীর দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণা, ডমরু, পটহ, ত্রিতন্ত্রী, বিপঞ্চী, মৃদঙ্গ. পণব, ডিণ্ডিম, ডম্বরু, মুরজ, চেলিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রসাধন ব্যাপারে সেই যুগে রমণীগণ বিশেষ আগ্রহান্বিতা ছিলেন। তাহারা অঙ্গরাগ ব্যবহার করিতেন, সুগন্ধি তৈল, সূক্ষ্ম বস্ত্র, অলঙ্কার ও মাল্য ব্যবহার করিতেন। স্নান রাক্ষসের দৈনিক কার্য্য ছিল। পুরুষও অলঙ্কার পরিধান করিত। বিভীষণ রামের সম্মুখে সমুপস্থিতা নারীর বিবরণ প্রদানের সময় বলিয়াছিলেন,

রাক্ষসনারীর প্রসাধন

স্নানানি চাঙ্গরাগাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
চন্দনানি চ মাল্যানি দিব্যানি বিবিধানি চ॥
অলঙ্কারবিদশ্চৈতা নার্য্যঃ পদ্মনিভেক্ষণাঃ।
উপস্থিতা বাং বিধিবৎ স্নাপয়িষ্যন্তি রাঘব॥ ৬।১২৩।২-৩

নারীর সতীত্ব :—সতীত্ব শব্দের মূল বস্তু হইল একপতিভাব, এক পতিত্বে নিষ্ঠা। পুরুষ বহু বিবাহ এবং বহু নারী সম্ভোগ করিত, উহা দোষণীয় ছিল না। পিতা পুত্র কন্যার বিবাহ দিবেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নীর বিবাহ দিবেন। রাবণ বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ এবং শূর্পণখার বিবাহ দিয়াছেন। রাক্ষসরাজ আত্মীয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন :—

রাক্ষস নারীর সতীত্ব

দদৌ তাং কালকেয়ায় দানবেন্দ্রায় রাক্ষসীম্।
স্বসাং শূর্পণখাং নাম বিদ্যুজ্জিহ্বায় রাক্ষসঃ॥ ৭।১২।২

... ...

বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বজ্রজ্বালেতি নামতঃ॥
তাং ভার্য্যাং কুম্ভকর্ণস্য রাবণঃ সমকল্পয়ৎ।
গন্ধর্ব্বরাজস্য সুতাং শৈলুষস্য মহাত্মনঃ॥
সরমাং নাম ধর্ম্মজ্ঞাং লেভে ভার্য্যাং বিভীষণঃ। ৭।১২।২৩-২৫

রাবণের মাতৃষ্বসা ভগিনী কুম্ভীনসীকে যথাকালে বিবাহ না দেওয়ার জন্য বিভীষণ রাবণকে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন; "যস্মাদবশ্যং দাতব্যা কন্যা ভর্ত্রে হি ভ্রাতৃভিঃ।" ৭।৩০।২৮

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যথেষ্ট প্রীতি ও শ্রদ্ধা রাক্ষসের সমাজে শ্লাঘনীয় ছিল। মধু দৈত্যকে নিধন করিবার জন্য রাবণ মধুপুরে উপস্থিত হইলেন। তখন কুম্ভীনসী রাবণের পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার পতিকে বধ করিবেন না। কুলস্ত্রীগণের পক্ষে স্বামীর মৃত্যুতুল্য ভয় ইহলোকে আর দ্বিতীয় নাই। নারীর পক্ষে বৈধব্য সর্ব্বধিক দুর্দ্দৈব।"

রাক্ষস নারীর স্বামীপ্রীতি

সুতরাং নারীর পক্ষে বিবাহ সামাজিক ব্যবস্থায় অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। স্বামীর নিধন কুলস্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত দুর্দ্দৈব ছিল। বৈধব্য নারীর জীবনে ভীষণতম বিপদ ছিল। মন্দোদরীর বিলাপের সময়ও তিনি বৈধব্যকে নারী জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ দুর্দ্দৈব বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

পুরুষ একাধিক বিবাহ করিলেও রাক্ষস নারী এক পতিত্বকেই আদর্শ বিবেচনা করিতেন। নারীর আদর্শ বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বিবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠান কিনা; পুরুষ নারীর দেহজ সম্বন্ধ বিবাহাতিরিক্ত পুরুষের সঙ্গে হইতে পারে কিনা; বিনিয়োগ প্রথা সমর্থনযোগ্য কি না? দ্বিতীয়তঃ স্বামী

বর্ত্তমানে স্ত্রীর অনিচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বৈধ কি? যথা রুমা ও বালী। অথবা অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহাতিরিক্ত বিহার সমাজ-সম্মত কি? তৃতীয়তঃ স্বামীর মৃত্যুর পর তারা ও সুগ্রীবের এবং বিভীষণ ও মন্দোদরীর বিবাহ হইয়াছিল কি? চতুর্থতঃ এক নারীর একাধিক স্বামী ধর্ম্মসঙ্গত কি? পঞ্চমতঃ বিধবা বিবাহ রাক্ষস-সমাজে প্রচলিত ছিল কি?

রাক্ষসের বিবাহ

রাক্ষস সমাজে বিবাহ প্রথা ছিল, অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ হইত—যথা ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীর সঙ্গে রাবণের অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ হইয়াছিল এবং রাবণ মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই। রাক্ষসদের বিবাহের সংস্কার ও উৎসব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কৈকসী, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা, কুম্ভানসীর বিবাহ হইয়াছে জানা যায়—কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠান ও আচার কিরূপ ছিল তাহার উল্লেখ নাই। তবে রাক্ষসের বিবাহে ধর্ম্মসংস্কার ছিল। আর্য্য সমাজে রাক্ষস বিবাহ নিন্দনীয় হইলেও অশাস্ত্রীয় নয়; স্মৃতিতে অষ্ট প্রকারের মধ্যে রাক্ষস বিবাহ সপ্তম।

মানব, যক্ষ, বানর, অপ্সরা, কিন্নরী, বিদ্যাধর, ঋক্ষ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বিনিয়োগ প্রথা ছিল। ব্রহ্মা স্বয়ং দেবতাগণকে ঐ সমস্ত জাতীয় নারীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন—

> উবাচ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানিদম্॥ ১।১৭।১
>
> ....
>
> অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু গন্ধর্ব্বীণাং তনূষু চ।
> যক্ষপন্নগকন্যাসু ঋক্ষবিদ্যাধরীষু চ॥
> কিন্নরীণাঞ্চ গাত্রেষু বানরীণাং তনূষু চ।
> সৃজধ্বং হরিরূপেন পুত্রাংস্তুল্যপরাক্রমান্॥ ১।১৭।৫-৬

এখানে রাক্ষসদের সঙ্গে বিনিয়োগের কোন উল্লেখ নাই। সমগ্র

রামায়ণে রাক্ষসদের সম্পর্কে বিনিয়োগের কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। রাক্ষস বংশের প্রায় সকলেরই পিতৃপরিচয় পাওয়া যায়।. রাক্ষসের সঙ্গে পিশাচেরও বিবাহ হইত।

রাক্ষসদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা ছিল; রাক্ষস রাজকুমারী শূর্পণখা বিধবা হইলেও দশরথ তনয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণ মন্দোদরীর সঙ্গে বিহার করিয়াছেন; কিন্তু বিবাহ সূচক কোন অনুষ্ঠান হইয়াছিল কিনা তাহার উল্লেখ নাই। শুধু বিবাহাতিরিক্ত যৌন বিহারের প্রথা ছিল। কারণ রাবণের অন্তঃপুরে বহুশত বিবাহিতা, অবিবাহিতা, অপহৃতা নারীর উল্লেখ আছে। রাক্ষস রাজান্তঃপুরে অবগুণ্ঠন প্রথা ছিল। রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় অবগুণ্ঠিতা অন্তঃপুরিকাগণ শিবিকা আরোহণে শ্মশানে গমন করিয়াছিলেন।

রাক্ষস পরিবারে বিধবা বিবাহ

বহুবিবাহ :—রাক্ষসগণ বহুবিবাহ করিত। বিবাহ প্রথা রাক্ষস সমাজে প্রচলিত থাকিলেও বিবাহাতিরিক্ত যৌন সম্বন্ধ অপ্রচলিত ছিল না—প্রায় সকল রাক্ষস পুরুষ স্বৈরাচারী ছিল। স্বামী বর্ত্তমানে পরপুরুষের সঙ্গে রমণ প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ নাই; তবে স্বামীর অবর্ত্তমানে স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিহার (?) রীতি সম্মত ছিল। মন্দোদরী রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণের সঙ্গে রমণ করিয়াছেন, যেমন করিয়াছিলেন তারা সুগ্রীবের সহিত বালীর মৃত্যুর পর। ইহা সমাজে নিন্দনীয় ছিল না।

বহুবিবাহ

উপসংহার :—রামায়ণের বর্ণনায় রাক্ষসসমাজের চিত্র প্রায় মনুষ্য সমাজের অনুরূপ। জাতকর্ম্ম, কৌলিক আচার, শ্রেণীবিভাগ, শিক্ষা, বেদাচার, গার্হস্থ্য জীবন, রাষ্ট্র গঠন, ধর্ম্মবিশ্বাস, প্রেতকৃত্য, প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়ই রাক্ষস ও আর্য্য সমাজে একরূপ ছিল। সমাজের সংস্কারগুলি প্রায় একই ধারা অনুসরণ করিয়াছে।

রাক্ষসের ভাষা, কথ্য কিম্বা লেখ্য, আর্য্য ভাষা হইতে বিভিন্ন ছিল বলিয়া বাল্মীকি উল্লেখ করেন নাই। রাক্ষস সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী অধিকতর ইহলৌকিক। সেইজন্যই তাহারা শক্তি অর্জ্জন করিয়া জীবনকে অধিকতর উপভোগ করিবার আয়োজন করিয়াছেন। রাক্ষস সমাজের বসন, ভূষণ, খাদ্য, প্রসাধন, বাসস্থান, কেলিগৃহ, পানশালা, শয্যা, পর্য্যঙ্ক, যানবাহন প্রভৃতি সমস্ত জিনিসই বস্তুতান্ত্রিক উৎকর্ষের চরম নিদর্শন *। অন্যদিক দিয়া সামাজিক আচার ব্যবহার এবং পারিবারিক সম্বন্ধের মধ্যেও একটা সুশৃঙ্খল আদর্শ ছিল। নারী যেমন একদিকে ভোগবিলাসের সামগ্রী ছিলেন, অন্যদিকে কুম্ভীনসী, সরমা, মন্দোদরী প্রভৃতি নারীর মধ্যে উচ্চ আদর্শ ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে স্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মধ্যে মন্দোদরী অন্যতমা। † রাক্ষস সমাজে একটি ধর্ম্মীয় পরিবেশ ছিল। সামাজিক আদর্শ ইহকালের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিলেও পরলোককে রাক্ষসগণ অস্বীকার করে নাই। রাক্ষসদের শ্রাদ্ধ, প্রেত কৃত্যাদি আলোচনা করিলে মনে হয় যে, পরলোক রাক্ষস সমাজের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

---

* রাক্ষস সমাজের বসন, ভূষণ, খাদ্য, পানীয়, যানবাহন, বাসগৃহ, স্থাপত্য সম্বন্ধে 'লঙ্কার ঐশ্বর্য্য' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

† কুন্তী দ্রোপদী অহল্যা তারা মন্দোদরী।
পঞ্চ কন্যাং স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

সপ্তম অধ্যায়

রাক্ষসের ধর্ম্মজীবন

ধর্ম্ম শব্দের দুইটি দিক আছে। একটি মনের দিক; অন্যটি অনুষ্ঠানের দিক। মনের দিকে প্রচ্ছদপটে রহিয়াছে ধারণা, বিশ্বাস, ধ্যান; কর্ম্মের দিকে রহিয়াছে জপতপ, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়া কাণ্ড। দুইটি দিককে একত্র বিচার করিলে ধর্ম্মজীবনকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়—ধর্ম্মের উপাস্য, উপাসনা, উপাসক এবং সম্প্রদায়।

ধর্ম্মের সংজ্ঞা

রাক্ষসের উপাস্য—যাঁহারা বিশ্বাসী বা আস্তিক, তাঁহারা কোন না কোন শক্তির অস্তিত্বে আস্থাবান। সেই শক্তি ব্যক্তিক বা নৈর্ব্যক্তিক-- দুই ভাবে কল্পনা করা যায়। রাক্ষসগণ প্রথম হইতে উপাস্য দেবতার অস্তিত্বে আস্থাবান ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাক্ষসের পূর্ব্ব পুরুষ সুকেশ মহাদেবের বরে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র—মাল্যবান, সুমালী এবং মালী। পিতাকে মহেশ্বরের অনুগৃহীত লব্ধবর ও পরম ঐশ্বর্য্যশালী দেখিয়া তাঁহারা মেরু পর্ব্বতে গমন করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা সুকেশ তনয়ত্রয়কে বর দিলেন, তোমরা অজেয়, শত্রু-হন্তারক ও চিরজীবী হইবে।

উপাস্য

অজেয়াঃ শত্রুহন্তারস্তথৈব চিরজীবিনঃ। ৭।৫।১৪

বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসদিগকে লঙ্কাপুরীতে অবস্থান করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। লঙ্কার দুর্জ্জয় দুর্গে বাস করিয়া এই তিন রাক্ষস পুঙ্গব দেবদৈত্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল যে, তপস্যার দ্বারা দেবদৈত্য অপেক্ষাও শক্তিশালী হওয়া সম্ভব। সুতরাং প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ শক্তি, সম্পদ ও অমরত্ব লাভের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে শক্তি ও সম্পদ লাভের জন্য হিরণ্যকশিপু,

নমুচি, কালনেমি, সংগন, অমল, অর্জ্জুন, শুম্ভ ও নিশুম্ভ যজ্ঞ করিয়া শক্তিশলী হইয়াছিলেন।

সর্ব্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সর্ব্বে মায়াবিদস্তথা। ৭।৬ ৩৭

ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের বরে দৃপ্ত হইয়া মাল্যবান, সুমালী এবং মালী দেবতা, ঋষি এবং চারণদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে ব্রহ্মার পরামর্শে বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া রাক্ষসদের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া অনেক রাক্ষস নিপাত করিলেন। রাক্ষসরাজ সুমালী স্বজনগণ সহ পাতালে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। লঙ্কার সিংহাসন শূন্য হইল। বিশ্রবার পুত্র কুবের তারপর লঙ্কায় রাজত্ব আরম্ভ করিলেন।

সুমালী রাক্ষস এই অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি বিশ্রবাপুত্র কুবেরকে লঙ্কা হইতে বিতাড়িত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুমালী চিন্তা করিলেন, বিশ্রবার পুত্রকে লঙ্কা হইতে বিতাড়িত করিতে হইলে বিশ্রবার ঔরসজাত পুত্র দ্বারাই সম্ভব হইবে। সুতরাং সুমালী স্বীয় কন্যা কৈকসীর সঙ্গে বিশ্রবার পরিণয়ের ব্যবস্থা করিলেন। বিশ্রবামুনির ঔরসে কৈকসীর গর্ভে রাবণের জন্ম হইল। সুতরাং দেখা যায় যে, রাবণের রক্তে তপোবল সমন্বিত মহাপুরুষের বীজ ছিল।

একদা মাতা কৈকসী কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া রাবণকে বলিলেন—"তুমি এইরূপ কর্ম্ম কর, যাহাতে বৈশ্রবণের অনুরূপ হইতে পার।"

দশগ্রীব তথা যত্নং কুরুষ্বামিতবিক্রম।
যথা ত্বমপি মে পুত্র ভবের্বৈশ্রবণোপমঃ॥ ৭।৯।৪৩

মাতৃভক্ত রাবণ মাতৃ-ইচ্ছা পুরণের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তপস্যার দ্বারা তেজ প্রভাবে ভ্রাতার তুল্য অথবা ততোধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন। কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণকে সঙ্গে লইয়া রাবণ গোকর্ণ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিন ভ্রাতা কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে

সন্তুষ্ট করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা রাবণকে "ধর্ম্মজ্ঞ" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন এবং রাবণের অভীষ্ট বর দান করিলেন।

পিতামহস্ত্ব......... ....অভ্যভাষত ॥
শীঘ্রং বরয় ধর্ম্মজ্ঞ বরো যস্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ।
কং তে কামং করোম্যদ্য ন বৃথা তে পরিশ্রমঃ॥ ৭।১০।১৩-১৪

রাক্ষসের ধর্ম্মোদ্দেশ্য—সুতরাং দেখা যায় যে—উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, শক্তি, সম্পদ ও অমরত্ব লাভের জন্য রাক্ষসগণ দুষ্কর তপস্যা করিয়াছে। একমাত্র বিভীষণ ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "আমাকে এই বর দিন যাহাতে আমার ধর্ম্মে মতি চিরন্তন হয়।" ব্রহ্মা বিভাষণকে এই বর দিলেন এবং স্বেচ্ছায় অমরত্ব দান করিলেন।

বিভীষণ ত্বয়া বৎস ধর্ম্মসংহিতবুদ্ধিনা ॥
পরিতুষ্টোঽস্মি ধর্ম্মাত্মন্ বরং বরয় সুব্রত।
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা বচনং প্রাহ সাঞ্জলিঃ॥ ৭।১০।২৭-২৮

এই সমস্ত ঘটনা হইতে অনুমান করা যায় যে, রাক্ষসগণ প্রথমে ব্রহ্মা এবং পরে মহেশ্বরের তপস্যা করিত। রাক্ষসগণ স্বয়ং তপস্যা করিলেও দেবতা মুনি ঋষিদের যাগ যজ্ঞ তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিত। বোধহয় রাক্ষসগণ ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরের অনুগ্রহকেই সমস্ত বলবীর্য্য এবং শক্তি সম্পদের অন্যতম উৎস বলিয়া বিবেচনা করিত। যাগ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত লাভ করা যায় —এই ধারণা সমসাময়িক যুগে বদ্ধমূল ছিল। ইন্দ্রও তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য অম্বরীষ রাজার যজ্ঞপশু হরণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত অপ্সরা প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রই যদি যজ্ঞ ফল লাভের প্রতিযোগিতায় এই সমস্ত উপায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে বলবান রাক্ষসগণ এইরূপ করিবে—তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

রাক্ষসগণ যজ্ঞ করিত, ইহা নিঃসন্দেহ। দেবতা, দানব, যক্ষ এবং নাগগণও যজ্ঞ করিত। যাগযজ্ঞে প্রদত্ত আহুতি গ্রহণের জন্য অগ্নি,

ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিতেন। রাবণ মুনিঋষিদের যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য সুবাহু, মারীচ প্রভৃতি বলবীর্য্য ও শক্তিশালী রাক্ষসদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। রাবণ স্বয়ং রাজা মরুত্তের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ইন্দ্র, যম, বরুণ এবং কুবের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত। রাবণের ভয়ে ইন্দ্র ময়ূর-রূপ, যম কাক-রূপ, বরুণ হংস-রূপ এবং কুবের কৃকলাস-রূপ ধারণ করিলেন।

রাক্ষসের উপাসনা বিধি

দৃষ্ট্বা দেবাস্তু তদ্রক্ষো বরদানেন দুর্জ্জয়ম্।
তির্য্যগ্ যোনিং সমাবিষ্টাস্তস্য ধর্ষণভীরবঃ॥
ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবৃত্তো ধর্ম্মরাজস্তু বায়সঃ।
কৃকলাসো ধনাধ্যক্ষো হংসশ্চ বরুণোঽভবৎ॥ ৭'১৮।৪-৫

রাবণ যজ্ঞে উপস্থিত মহর্ষিদিগকে ভক্ষণ করিয়া তাঁহাদের রক্তে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

তান্ ভক্ষয়িত্বা তত্রস্থান্ মহর্ষীন্ যজ্ঞমাগতান্।
বিতৃপ্তো রুধিরৈস্তেষাং পুনঃ সম্প্রযযৌ মহীম্॥ ৭।১৮।১৯

রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কুবেরকে পরাজিত করিলেন এবং কৈলাস পর্ব্বতের অদূরে শরবণে উপস্থিত হইলেন। তখন শরবণে শঙ্কর এবং উমা অবস্থান করিতেছিলেন। রাবণ বীরগর্ব্বে শরবণের অশান্তি জন্মাইতে লাগিলেন। শঙ্কর অঙ্গুষ্ঠ চালনা করিয়া শরবণের এমন অবস্থা সৃষ্টি করিলেন যে সমস্ত রাক্ষস সৈন্য বাহু পীড়ায় কাতর হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রাবণের বাহুও ভীষণ ক্লিষ্ট হইল। মন্ত্রিগণের পরামর্শে রাবণ শঙ্করের উদ্দেশ্যে সামবিহিত স্তব করিতে লাগিলেন। রাবণ দীর্ঘকাল মহাদেবের নিকট ক্রন্দন করিলেন। আশুতোষ রাবণের প্রতি তুষ্ট হইয়া চন্দ্রহাস নামক খড়্গ এবং শাপাদি দ্বারা অবিনাশী অবশিষ্ট আয়ু দান করিলেন।

সামভির্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ।
সংবৎসরসহস্রন্তু রুদতো রক্ষসো গতম্॥ ৭।১৬।৩৪

দদৌ খড়্গং মহাদীপ্তং চন্দ্রহাসমিতি শ্রুতম্ ॥
আয়ুষশ্চাবশেষঞ্চ দদৌ ভূতপতিস্তদা ॥ ৭।১৬।৪৩-৪৪

লঙ্কাকাণ্ডে রাম রাবণের যুদ্ধের সময় বিখ্যাত বীর দেবান্তক, ত্রিশিরা এবং অতিকায় নিহত হইলে রাবণ শোকবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পিতাকে শোকার্ত্ত ও অশ্রুপ্লুত দেখিয়া বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা উদ্যানে যজ্ঞশালায় গমন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্রে অগ্নিতে মাল্য ও গন্ধদ্রব্য প্রদান করিলেন। তারপর লাজাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া ঘৃতাহূতি প্রদান আরম্ভ করিলেন। সেই অগ্নিতে মেঘনাদ তাঁহার যুদ্ধাস্ত্রগুলিও পুষ্পরূপে আহূতি দিলেন। যজ্ঞের জন্য ব্যবহার করা হইল—বিভীতক কাষ্ঠ (বয়ড়া কাঠ), রক্তবর্ণ বস্ত্র, এবং কৃষ্ণবর্ণ লৌহ পাত্র। কৃষ্ণবর্ণ সজীব একটি ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রজিৎ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে হোম করিলেন। অস্ত্র বিশারদ ইন্দ্রজিৎ আসন, অস্ত্র, ধনু, রথ ও কবচকে ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ

ততস্তু হুতভোক্তারং হুতভুক্সদৃশপ্রভঃ।
জুহুবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিধিবন্মন্ত্রসত্তমৈঃ ॥
স হবির্লাজসৎকারৈর্মাল্যগন্ধপুরস্কৃতৈঃ।
জুহুবে পাবকং তত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥
শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোঽথ বিভীতকাঃ।
লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা ॥
ছাগস্য কৃষ্ণবর্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ।
সকৃদেব সমিদ্ধস্য বিধূমস্য মহার্চ্চিষঃ।
সোঽস্ত্রমাহারয়ামাস ব্রাহ্মমন্ত্রবিশারদঃ।
ধনুশ্চাত্মরথঞ্চৈব কবচং চাভ্যমন্ত্রয়ৎ ॥ ৬।৭৩।১৮-২১,২৪

এই যুদ্ধে রাম এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের হোমাগ্নিপুত অস্ত্রদ্বারা আহত

ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। হনুমান কর্ত্তৃক আনীত মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী নামক চারিটি ঔষধের গন্ধে রাম লক্ষ্মণ এবং বানরসৈন্যগণ সুস্থ হইলেন।

রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে আরও একস্থানে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ বিষয়ের উল্লেখ আছে। রাক্ষসবীর মকরাক্ষ নিহত হইয়াছেন। রাবণ তখন ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন। পূর্ব্বে অতিকায় প্রভৃতি বীরগণের মৃত্যুর পর ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। এইবার রাবণ ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধে গমনের আদেশ দিলেন। ইন্দ্রজিৎ পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পূর্ব্ববৎ যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন এবং অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিলেন। হোমের সময় হোম-পরিচারিকা উপস্থিত থাকিত। তাহারা রক্তোষ্ণীষ পরিধান করিত। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞকালে বিভীতক কাষ্ঠ, রক্তবস্ত্র, কৃষ্ণলোহ নির্ম্মিত যজ্ঞপাত্র, সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগ ব্যবহার করিতেন। নিজের যুদ্ধাস্ত্র পুষ্পপত্রের মত আহুতি দিতেন।

যজ্ঞরীতি

যজ্ঞভূমৌ স বিধিবৎ পাবকং জুহবেন্দ্রজিৎ ॥
জুহ্বতশ্চাপি তত্রাগ্নিং রক্তোষ্ণীষধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আজগ্মুস্তত্র সম্ভ্রান্তা রাক্ষস্যো যত্র রাবণিঃ ॥
শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোহথ বিভীতকাঃ।
লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা ॥
সর্ব্বতোহগ্নিং সমাস্তীর্য্য শরপত্রৈঃ সতোমরৈঃ।
ছাগস্য সর্ব্বকৃষ্ণস্য গলং জগ্রাহ জীবতঃ ॥ ৬।৮০।৫-৮

হোমাগ্নিতে শোণিত আহুতি প্রদান করা রাক্ষসের প্রথা ছিল। ইন্দ্রজিৎ রাম-রাবণ যুদ্ধের সময় তিনবার নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। অগ্নিতে আহুতি দান করিলে হোমশোণিত-ভোজী হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

স হোতুকামো দুষ্টাত্মা গতশ্চৈত্যং নিকুম্ভিলাম্ ॥
নিকুম্ভিলামধিষ্ঠায় পাবকং জুহবেন্দ্রজিৎ।
যজ্ঞভূম্যাং ততো গত্বা পাবকস্তেন রক্ষসা ॥

হূয়মানঃ প্রজজ্বাল হোমশোণিতভুক্ তদা।
সোঽর্চ্চিঃগিনদ্ধো দদৃশে হোমশোণিতভর্পিতঃ। ৬।৮২।২৪-২৬

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মাতৃআদেশে রাবণ তপস্যা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃগণ সহ গোকর্ণাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। রাবণ অনাহারে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন—দশবর্ষসহস্রস্তু নিরাহারো দশাননঃ। (৭।১০।১০) তপস্যার এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি একটি মস্তক ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে আহূতি দিলেন।

রাবণের তপস্যা

এইরূপে তাঁহার নয় সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল। একটি একটি করিয়া তাঁহার নয়টি মস্তকই অগ্নিমধ্যে আহূতিস্বরূপ প্রদত্ত হইল। দশ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইলে দশগ্রীব দশম মস্তকটি আহূতি দিতে উদ্যত হইলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং দশগ্রীবকে বরদান করিলেন—রাবণ দেব দানব যক্ষ রক্ষগণের অবধ্য হইলেন। পিতামহ তাঁহাকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন।

শীঘ্রং বরয় ধর্ম্মজ্ঞ বরো যস্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ। ৭।১০।১৩

কুম্ভকর্ণ সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে বাস করিতেন। বর্ষাকালে মেঘনিঃসৃত জলসিক্ত হইয়া বীরাসনে তপস্যা করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ কুম্ভকর্ণ অতি সৎপথে থাকিয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার নিকট বৎসরে ছয় মাস নিদ্রাসুখের বর প্রার্থনা করিলেন।

কুম্ভকর্ণের তপস্যা

কুম্ভকর্ণস্ততো যত্তো নিত্যং ধর্ম্মপথে স্থিতঃ।
ততাপ গ্রীষ্মকালে তু পঞ্চাগ্নীন্ পরিতঃ স্থিতঃ॥
মেঘাম্বুসিক্তো বর্ষাসু বীরাসনমসেবত।
নিত্যঞ্চ শিশিরে কালে জলমধ্যপ্রতিশ্রয়ঃ॥
এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তস্যাপচক্রমুঃ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য সৎপথে নিষ্ঠিতস্য চ॥ ৭।১০।৩-৫

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সর্ব্বদা শুচি হইয়া একপদে পাঁচ সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তারপর ঊর্দ্ধবাহু, ঊর্দ্ধশির হইয়া স্বীয় সংকল্পে স্থির থাকিয়া পাঁচ সহস্র বৎসর সূর্য্যের অনুবর্ত্তন করিলেন।

বিভীষণের তপস্যা

বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্মপরঃ শুচিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিবান্॥
সমাপ্তে নিয়মে তস্য ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
পপাত পুষ্পবর্ষঞ্চ তুষ্টুবুশ্চাপি দেবতাঃ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি সূর্য্যঞ্চৈবান্ববর্ত্তত।
তস্থৌ চোর্দ্ধশিরোবাহুঃ স্বাধ্যায়ে ধৃতমানসঃ॥ ৭।১০।৬-৮

রাবণপুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করিলেন। ব্রহ্মা মেঘনাদের নিকট দেবরাজ ইন্দ্রকে মুক্তির জন্য লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। মেঘনাদ একটি সর্ত্তে ইন্দ্রকে মুক্তি দিতে স্বীকার করিলেন। সর্ত্তটি হইল এই যে, "বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপূত বারি দ্বারা আমি বৈশ্বানরকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া জয়াভিলাষে যখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিব, তখনই আমার জন্য অগ্নি হইতে অশ্ব সংযোজিত রথ উত্থিত হইবে। সেই রথে আরূঢ় হইলে আমি অমর হইব। যদি সেই যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকিতে আমি যুদ্ধ আরম্ভ করি, তবে যুদ্ধে আমার বিনাশ হইবে।"

মমেষ্টং নিত্যশো হব্যৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সংপূজ্যপাবকম্।
সংগ্রামমবতর্ত্তুঞ্চ শত্রুনির্জ্জয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥
অশ্বযুক্তো রথো মহ্যমুত্তিষ্ঠেত্তু বিভাবসোঃ।
তৎস্থস্যামরতা স্যান্মে এষ মে নিশ্চিতো বরঃ॥
তস্মিন্ যদ্যসমাপ্তে চ জপ্য হোমে বিভাবসৌ।
যুধ্যেয়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্যাদ্বিনাশনম্॥ ৭।৩৫।১২-১৪

সুতরাং দেখা যায়, মেঘনাদ স্বয়ং তাঁহার অমরত্বের জন্য আত্মকৃত যজ্ঞের উপর নির্ভর করিলেন। মেঘনাদ কর্ত্তৃক কৃত যজ্ঞের নাম নিকুম্ভিলা যজ্ঞ। নিকুম্ভিলা ছিল একটি দারুবৃক্ষ সমাকীর্ণ উদ্যান, সেখানে যজ্ঞশালা ছিল, চৈত্য ছিল। নিকুম্ভিলা অর্থে যজ্ঞাগার।

রাক্ষসেরা মন্ত্রপাঠ করিত। হনুমান লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিয়া স্বাধ্যায়নিরত রাক্ষসদিগের মন্ত্রধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শুশ্রাব জপতাং তত্র মন্ত্রান্ রক্ষোগৃহেষু বৈ॥
স্বাধ্যায়নিরতাংশ্চৈব যাতুধানান্ দদর্শ সঃ। ৫।৪।১২-১৩

রাক্ষস বীরদের গৃহে হনুমান ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেখানে রাক্ষসগণ সতত ইষ্টদেবতার অর্চ্চনায় রত ছিল।

ভেরীমৃদঙ্গাভিরুতং শঙ্খঘোষবিনাদিতম্।
নিত্যার্চ্চিতং পর্ব্বসুতং পূজিতং রাক্ষসৈঃ সদা॥ ৫।৬।১২

রাক্ষসদের মধ্যেও বেদজ্ঞ ছিলেন। রাত্রিশেষে হনুমান ষড়ঙ্গ বেদবিধ যজ্ঞযাজী ব্রহ্মজ্ঞ রাক্ষসোচ্চারিত বেদধ্বনি শুনিয়াছিলেন।

ষড়ঙ্গবেদবিদুষাং ক্রতুপ্রবরযাজিনাম্।
শুশ্রাব ব্রহ্মঘোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্মরক্ষসাম্॥ ৫।১৮।২

রাবণকে ব্রহ্মা বিধি মন্ত্র দান করেন। ঐ মন্ত্র জপ করিলে মৃত্যু রোধ করা যায়।

মন্ত্রপ্রকীর্ত্তনাদেব প্রাপ্স্যসে সমরে জয়ম্।
নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত॥ ৭।২৭।৩১

বিভীষণ রাবণের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণগণ ভ্রাতার বিজয়সূচক পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। সেই ব্রাহ্মণদের হস্তে পুষ্প, অক্ষত, দধি ও ঘৃতপূর্ণপাত্র ছিল।

অগ্রজস্যালয়ং বীরঃ প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ॥
পুণ্যান্ পুণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিদ্ভিরুদাহৃতান্।
শুশ্রাব সুমহাতেজা ভ্রাতুর্বিজয়সংশ্রিতান্॥
পূজিতান্ দধিপাত্রৈশ্চ সর্পির্ভিঃ সুমনোঽক্ষতৈঃ।
মন্ত্রবেদবিদো বিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ॥ ৬।১০।৭-৯

ইহা হইতে বুঝা যায় যে রাক্ষসদের মধ্যে বেদমন্ত্রবিদ্ তন্ত্রাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহারা পূজার জন্য পুষ্প, অক্ষত (যব), দধি, ঘৃত ব্যবহার করিতেন।

রাক্ষসগণ যজ্ঞে পশুরক্ত আহুতি দিত। রাবণ ভগ্নি শূর্পণখার সাহায্যার্থ খর-দূষণকে রণস্থলে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং নিকুম্ভিলা উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। সেই উদ্যানে দিব্য দেবায়তন ছিল। রাবণ দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিৎ কৃষ্ণাজিন পরিধান করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে যজ্ঞ আরম্ভ করিতেছেন। সম্মুখে শত যূপকাষ্ঠ যজ্ঞার্থ পশুবলির জন্য প্রস্তুত।

ততো নিকুম্ভিলা নাম লঙ্কোপবনমুত্তমম্।
ভগ্রাক্ষসেন্দ্রো বলবান্ প্রবিবেশ সহানুগঃ॥
ততো যূপশতাকীর্ণং সৌম্যচৈত্যোপশোভিতম্।
দদর্শ বিষ্ঠিতং যজ্ঞং শ্রিয়া সম্প্রজ্বলন্নিব॥
ততঃ কৃষ্ণাজিনধরং কমণ্ডলুশিখাধ্বজম্।
দদর্শ স্বসুতত্রত্র মেঘনাদং ভয়াবহম্॥ ৭।৩০।২-৪

রাবণের নিকট মহাতপা উশনা ঋষি ইন্দ্রজিৎ অনুষ্ঠিত যজ্ঞের বিবরণ দিয়া বলিলেন, "আপনার পুত্র অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব এবং মাহেশ্বর নামক সপ্তযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছেন—আপনার পুত্র এই স্থানে সাক্ষাৎ প্রজাপতির নিকট বহু বর লাভ করিয়াছেন। আকাশচারী কামগামী দিব্য রথ ও তামসী মায়া লাভ করিয়াছেন। এই মায়া দ্বারা তম (অবসাদ) উপস্থিত হইয়া থাকে; এই মায়া যুদ্ধে প্রয়োগ করিলে দেবতা বা অসুরেরা ইহার গতি জানিতে পারে না।"

উশনা ত্বব্রবীত্তত্র যজ্ঞসম্পৎসমৃদ্ধয়ে।
রাবণং রাক্ষসশ্রেষ্ঠং দ্বিজশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ॥
অহমাখ্যামি তে রাজন্ শ্রূয়তাং সর্ব্বমেব তৎ।
যজ্ঞাস্তে সপ্ত পুত্রেণ প্রাপ্তাস্তে বহুবিস্তরাঃ॥
অগ্নিষ্টোমোঽশ্বমেধশ্চ যজ্ঞো বহুসুবর্ণকঃ।
রাজসূয়স্তথা যজ্ঞো গোমেধো বৈষ্ণবস্তথা॥
মাহেশ্বরে প্রবৃত্তে তু যজ্ঞে পুম্ভিঃ সুদুর্লভে।
বরাংস্তে লব্ধবান্ পুত্রঃ সাক্ষাৎ পশুপতেরিহ॥ ৭।৩০।৬-৯

রাবণ পুত্রের বরলাভে সন্তুষ্ট হইলেও ইন্দ্রজিতের এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হন নাই ; কারণ, ইন্দ্রাদি দেবতা এই সমস্ত যজ্ঞে পূজিত হন এবং আহূতি গ্রহণ করেন। সুতরাং রাবণ বলিলেন, "ইন্দ্র, যম প্রভৃতি দেবতা আমার শত্রু, সুতরাং তাহাদিগকে পূজা করিয়া শোভন কর্ম্ম কর নাই। যাহা করিয়াছ, তাহা করিয়াছ, ভবিষ্যতে আর এইরূপ কার্য্য কখনো করিবে না।"

ততোঽব্রবীদ্দশগ্রীবো ন শোভনমিদং কৃতম্।
পূজিতাঃ শত্রবো যস্মাদ্দ্রব্যৈরিন্দ্রপুরোগমাঃ ॥
এহীদানীং কৃতং যদ্ধি সুকৃতং তন্ন সংশয়ঃ। ৭।৩০।১৪-১৫

ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, দেবতা ও রাক্ষসগণ একই পুরোহিতের (শুক্রচার্য অথবা শুক্রাচার্য্যের ভ্রাতা উশনা) সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং রাক্ষস ও দেবতাদের যজ্ঞ বিধির বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না।

অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ প্রভৃতি সাতপ্রকার যজ্ঞ দেবতা ও রাক্ষস সমভাবেই অনুষ্ঠান করিত।

মহাবীর প্রহস্ত যুদ্ধ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে রাক্ষস সৈন্যগণ ব্রাহ্মণ-দিগকে প্রণাম করিয়াছিল, হব্য দ্বারা অগ্নিকে তর্পণ করিয়াছিল। তাহাতে হব্যগন্ধসহ সুরভিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইল। পরে তাহারা মন্ত্রপূত বিবিধাকার মাল্য পরিধান করিল।

লঙ্কা রাক্ষসবীরৈস্তৈর্গজৈরিব সমাকুলা।
হুতাশনং তর্পয়তাং ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যতাম্॥
আজ্যগন্ধপ্রতিবহঃ সুরভির্মারুতো ববৌ।
স্রজশ্চ বিবিধাকারাঃ জগৃহুস্ত্বভিমন্ত্রিতাঃ॥ ৬।৫৭।২১-২২

রাবণ হৈহয়রাজ অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাবণ তাঁহার অনুচরগণকে পুণ্য সলিলা নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিয়া পাপ প্রক্ষালন করিতে আদেশ করিলেন।

রাবণ নর্ম্মদা জলে স্নান করিয়া বিধিমত মন্ত্র জপ করিলেন। তার-পর সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুক্ল বসন পরিধান করিলেন। রাবণ

বালুকা বেদী মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া গন্ধ দ্রব্য ও সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা পূজা করিলেন, তারপর মহাদেবকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন।

অস্যাং স্নাত্বা মহানদ্যাং পাপ্মানো বিপ্রমোক্ষথ। ৭।৩৬।৩৩
অবতীর্ণো নদীং স্নাতুং গঙ্গামিব মহাগজঃ।
তত্র স্নাত্বা চ বিধিবজ্জপ্ত্বা জপ্যমনুত্তমম্॥
নর্ম্মদাসলিলাত্তস্মাদুত্ততার স রাবণঃ।
ততঃ ক্লিন্নাম্বরং ত্যক্ত্বা শুক্লবস্ত্রসমাবৃতঃ॥ প্রাণতোষ সরকার
জাম্বূনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র স্ম নীয়তে॥
বালুকাবেদিমধ্যে তু তল্লিঙ্গং স্থাপ্য রাবণঃ।
অর্চ্চয়ামাস গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ॥
ততঃ সতামার্ত্তিহরং পুরং হরং বরপ্রদং চন্দ্রময়ূখভূষণম্।
সমর্চ্চয়িত্বা স নিশাচরো জগৌ
প্রসার্য্য হস্তান্ প্রননর্ত্ত চাগ্রতঃ॥ ৭।৩৬।৪২-৪৪

ইহাতে বুঝা যায় যে, রাবণ পুণ্য স্নানে বিশ্বাস করিতেন, মহাদেবের লিঙ্গপূজা করিতেন, পূজার উপকরণরূপে গন্ধ পুষ্প ব্যবহার করিতেন। পূজান্তে নৃত্যগীত রাক্ষসদের প্রথা ছিল।

রাবণের উপবীত ছিল; কারণ, তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ বিশ্রবা-মুনির পুত্র।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর ক্রুদ্ধ রাবণ সীতাকে নিধন করিবার জন্য অশোক বনে গমন করিলেন। সীতাকে হত্যা করিতে উদ্যত দেখিয়া শুদ্ধাচারী সুশীল মন্ত্রী সুপার্শ্ব রাবণকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন, "হে বীর রাক্ষসেশ্বর! যথাবিধি ব্রত স্নান ও বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া এবং তদনুরূপ অগ্নিহোত্রাদি স্বকর্ম্মে অনুরক্ত থাকিয়াও আপনি কি নিমিত্ত স্ত্রী বধে উদ্যত হইয়াছেন?"

সুপার্শ্বো..................
..........................অব্রবীৎ॥
কথং নাম দশগ্রীব সাক্ষাদ্বৈশ্রবণানুজ।
হন্তুমিচ্ছসি বৈদেহীং ক্রোধাদ্ধর্ম্মমপাস্য চ॥

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্ম্মনিরতস্তথা।
স্ত্রিয়ঃ কস্মাদ্বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর ॥ ৬৷৯৩৷৫৯-৬০

রাক্ষসের ধর্ম্ম-জীবনের রূপ ঃ—রাবণের ধর্ম্ম জীবনের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রাবণ যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করিতেন, পুণ্যস্নান করিতেন্ এবং ব্রত পালন করিতেন। স্ত্রী বধ রাক্ষসেরও অনুচিত কর্ম্ম ছিল, অর্থাৎ যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করিতেন, ব্রত স্নান ইত্যাদি পুণ্যকর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা স্ত্রীবধ রূপ অন্যায় কর্ম্ম করিতেন না। সুপার্শ্ব রাবণকে অমাবস্যাতে যুদ্ধযাত্রা করিতে উপদেশ দিলেন।

কৃত্বা নির্যাহ্যমাবস্যাং বিজয়ায় বলৈর্বৃতঃ। ৬৷৯৩৷৬২

রাক্ষস বেদ বিশ্বাসী ছিল, তাহারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিত; দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করিত। রাক্ষসগণ পূজা, যাগযজ্ঞ, জপ, তর্পণ, পুণ্যস্নান ইত্যাদি কর্ম্ম ধর্ম্মানুমোদিত বিবেচনা করিত এবং পাপ পুণ্য, পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিত। পুণ্যের ফল দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া রাক্ষসের বিশ্বাস ছিল।

পুণ্যাত্মাদের অভিশাপকে রাক্ষসগণ ভীষণ ভয় করিত। বোধ হয়, সেই যুগে মানুষ, দেবতা, যক্ষ প্রভৃতি সকলেই ন্যূনাধিক বাকসিদ্ধ ছিল। কারণ, তাহাদের উচ্চারিত অভিশাপ ফলপ্রদ হইত। রাবণের জীবন আলোচনা করিলে এ বিষয়টি সম্যক বুঝা যায়। সীতা রাবণের করায়ত্ত হইলেও রাবণ তাঁহার উপর অত্যাচার করেন নাই, কারণ রাবণের উপর অভিশাপ ছিল।

হনুমানও রাবণকে বলিয়াছিলেন, "আপনি মহাপ্রাজ্ঞ, আপনি ধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া তপঃ প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, অতএব পরস্ত্রী নিরোধ করা বা গোপন করিয়া রাখা আপনার উচিত নহে।"

তদ্ভবান্ দৃষ্টধর্ম্মার্থস্তপঃকৃতপরিগ্রহঃ।
পরদারান্ মহাপ্রাজ্ঞ নোপরোদ্ধুং ত্বমর্হসি ॥ ৫৷৫১৷১৭

রাক্ষস দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করিত। রাবণ নিহত হইলে মন্দোদরী

বিলাপের অবসরে রাবণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তোমার কোন দোষ নাই। দৈবই সকল অনর্থের মূল। দৈব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াই সকলে বিনষ্ট হয়। অধুনা রামচন্দ্র নিমিত্তমাত্র হইয়া তোমাকে বধ করিয়াছেন।"

> ন কামকারঃ কামং বা তব রাক্ষসপুঙ্গব।
> দৈবঞ্চেষ্টয়তে সর্ব্বং হতং দৈবেন হন্যতে॥ ৬।১১২।২৩

রাক্ষসের কুলদেবতা ছিল, চৈত্য ছিল। কুলদেবতার আলয়ই চৈত্য নামে অভিহিত। হনুমান যখন লঙ্কার বন উপবন ধ্বংস করেন, তখন প্রথমে তিনি কুলদেবতার আলয় বা চৈত্য ধ্বংস করেন নাই। অবশ্য পরে চৈত্য ধ্বংস করার কথাও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন।

> বনং ভগ্নং ময়া চৈত্যপ্রাসাদো ন বিনাশিতঃ॥
> তস্মাৎ প্রাসাদমপ্যেবমিমং বিধ্বংসয়াম্যহম্। ৫।৪৩।১-২

মানুষের মতন রাক্ষস পরলোক, কর্ম্মফল, পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিত। মৃতের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্য সহজভাবে করিত।

> পুনস্তস্মাৎ পরিভ্রষ্টা জায়ন্তে বসুধাতলে।
> পূর্ব্বার্জ্জিতৈঃ সুখৈর্দুঃখৈর্জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ॥ ৭।৪৩।২১

রাক্ষসদের সম্প্রদায়—রাক্ষসদিগের ধর্ম্মজীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মা ও শিবই তাহাদের প্রধান আরাধ্য দেবতা ছিল। তাহারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিত, বেদমন্ত্র পাঠ করিত। যজ্ঞানুষ্ঠান করিত, বলি প্রদান করিত। দধি, পুষ্প, অক্ষত, মালা ইত্যাদি পূজার্চ্চনাতে ব্যবহার করিত। রাক্ষসগণ পুণ্য সলিলে স্নান, শ্বেতবসন পরিধান, নৃত্যগীত দ্বারা উৎসব করিত। মৃদঙ্গ ইত্যাদি মঙ্গল বাদ্য ব্যবহৃত হইত। নারীগণ যজ্ঞে এবং পূজায় পুরোহিতের সাহায্য করিতেন। রাক্ষস সমাজে নারী-দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী একজন দেবী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিধিমত

পূজার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। রামায়ণ, * মহাভারত, পুরাণাদি গ্রন্থে যাতুধান, ব্রহ্মধান, শালকটঙ্কট, ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি রাক্ষস গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু উপাস্য ভেদে শৈব, শাক্ত ইত্যাদি কোন ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

---

* মহাভারতেও রাক্ষসদের যজ্ঞ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। ৪৭।৬১ সভা।

দেবতা, ঋষি ও অসুরগণ যজ্ঞে নিয়ত সুগন্ধ হবি বহন করিয়া থাকেন।

ত্রিশিরার তিনটি মুখ ছিল—একটি মুখ দ্বারা সুরাপান, দ্বিতীয় মুখে বেদপাঠ এবং তৃতীয় মুখ দ্বারা সোম করিতেন। সুতরাং দেখা যায়, রাক্ষসদের চরিত্র জটিল ছিল। সুন্দ উপসুন্দ বিন্ধ্য পর্ব্বতে গমন করিয়া দীক্ষিত ও সমাহিত হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদ, বিরোচন ও বলী উগ্র তপস্যা করিয়াছেন, বেদব্রাহ্মণের সেবা করিয়াছেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে উল্লেখ আছে যে, পুরাকালে দৈত্য দানব রাক্ষসগণ সকলেই বেদ ব্রত, বহুশ্রুত কামবিহারী ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। ৬০-২২৭ শান্তি॥

মারীচ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে সন্ন্যাস আশ্রমে নিয়ত তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। রাক্ষসদের মধ্যেও সন্ন্যাসাশ্রম ছিল।

অষ্টম অধ্যায়

রামায়ণে সৎকার, প্রেতকৃত্য এবং শ্রাদ্ধ

জীবমাত্রই মরণশীল অথচ জীবমাত্রই দেহকে অত্যন্ত আপনার মনে করে। জীবদেহের সঙ্গে মানুষ সহজে সম্বন্ধ নিঃশেষ করিতে চাহে না। মৃতদেহ প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই দেহ বিগলিত হইতে আরম্ভ করে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও মৃতদেহকে চিরন্তন করা অসম্ভব, সুতরাং এই ক্ষয়িষ্ণু মৃতদেহের যথোচিত গতি ব্যবস্থা আত্মীয়-স্বজন অত্যাবশ্যক মনে করে। সাধারণতঃ মানুষমাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে পরলোকে বিশ্বাস করে। পরলোকে সদ্গতি মানুষের ইহলোকের কর্ম্মের উপর নির্ভর করে বলিয়া মানুষের সহজ বিশ্বাস। সুতরাং মৃত ব্যক্তির সদ্গতি পারলৌকিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে; ইহাই মানুষের সহজ ধারণা। ইহলোকের কর্ম্মের জন্য মানুষ স্বয়ং দায়ী, কিন্তু মৃতদেহের সৎকারাদির জন্য দায়িত্ব পরবর্ত্তী আত্মীয়-স্বজনের। কোন কোন জাতির মধ্যে মৃতদেহ ভক্ষণ করার রীতি ছিল। কেহ বা মৃতদেহকে জলে নিক্ষেপ করে, তাহা মীন কুর্ম্ম কুম্ভীর ইত্যাদি জলজন্তুর খাদ্য, কেহ বা মৃতদেহকে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা চিরন্তন করিয়া রাখার প্রয়াস করে, কেহ বা দেহ অগ্নিদগ্ধ করিয়া অস্থি, নাভি ইত্যাদি অংশ জলে নিক্ষেপ করে। পরলোক, কর্ম্মফল, ঈশ্বর ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মৃতদেহের সৎকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মৃতদেহের সৎকার মানুষের সভ্যতা ও সংস্কার প্রমাণ করে। রামায়ণে নর, বানর, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি জাতির মধ্যে মৃতদেহ সৎকারের বহু উল্লেখ আছে। এই সৎকারবিধি, অশৌচপালন, শ্রাদ্ধ, উদগ্রদান, তর্পণাদি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় যেন এই জাতিগুলি একই প্রকার সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইত। পরলোক, কর্ম্মফল, ঈশ্বরে বিশ্বাস

প্রেতকৃত্যের বিভিন্ন রূপ

প্রভৃতি ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে একটা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ঐক্য ছিল। রামায়ণে দেবতাদের মৃত্যু এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কারণ দেবতাবৃন্দ অমৃত ভক্ষণ করিয়া অমর হইয়াছিলেন। রামায়ণে এই কয়েকটি মৃতদেহের সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারের উল্লেখ আছে ঃ—

নররাজ—দশরথ	বানররাজ—বালী
শাপগ্রস্ত—বিরাধ	রাক্ষস রাজকুমার—ইন্দ্রজিৎ
পক্ষিরাজ—জটায়ু	রাক্ষসরাজ—রাবণ

দশরথের প্রেতকৃত্য

মানবরাজ দশরথের মৃত্যুর সময় তাঁহার কোন পুত্রই অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না। রাম-লক্ষ্মণ বনবাসে ছিলেন, ভরত-শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে নন্দীগ্রামে ছিলেন; পুত্রাভাবে মুখাগ্নি হইতে পারে না, এই বিবেচনায় তাঁহার মৃতদেহ দশ দিন পর্য্যন্ত তৈলদ্রোণীতে রক্ষিত ছিল।

> ঋতে তু পুত্রাদ্দহনং মহীপতে-
> র্নারোচয়ংস্তে সুহৃদঃ সমাগতাঃ।
> ইতীব তস্মিন্ শয়নে ন্যবেশয়ন্
> বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্॥ ২।৬৬।২৭

দশরথের মৃত্যুর দশ দিবসান্তে ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের পরামর্শ অনুসারে রাজা দশরথের মৃতদেহ সৎকারের আয়োজন করা হইল। মৃতদেহকে তৈলপূর্ণ কটাহ হইতে উত্তোলন করিয়া ভূমিতে স্থাপন করা হইল।

সৎকারের সময় ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য্যের জন্য ঋত্বিক্, পুরোহিত এবং আচার্য্যের প্রয়োজন হইল। সেই যুগে অগ্নিহোত্রের যজ্ঞাগ্নি প্রায় সকল গৃহেই রক্ষিত থাকিত। সেই অগ্নি হইতে সংগৃহীত অগ্নি দ্বারা হোম করা হইত। দশরথের মৃতদেহ শিবিকামধ্যে স্থাপন করিয়া শ্মশানে নীত হইল। শবদেহের অগ্রে মৃত ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্ত স্বর্ণ রৌপ্য ও বস্ত্র রাজপথে বিতরণ করা হইল।

পদ্মক, দেবদারু এবং চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা চিতা সজ্জিত করা হইল।

চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুল প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য চিতামধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। ঋত্বিগ্‌গণ চিতামধ্যে দশরথের শব স্থাপন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন, কালোচিত মন্ত্র জপ করিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে সামগান করিলেন।

শ্মশানে রাজঅন্তঃপুরিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শিবিকা এবং রথে আরোহণ করিয়া শ্মশানে গমন করিয়াছিলেন। নারী ও ঋত্বিগ্‌গণ চিতাগ্নি প্রদাক্ষিণ করিলেন। শবদাহ শেষ হইলে রাজকুমার ভরত পুরনারী, পুরোহিত এবং অমাত্যগণ সহ সরযূতীরে গমন করিয়া উদকক্রিয়া বা তর্পণাদি কার্য্য বিধিমত সম্পন্ন করিলেন।

কৃত্বোদকং তে ভরতেন সার্দ্ধং
নৃপাঙ্গনা মন্ত্রিপুরোহিতাশ্চ।
পুরং প্রবিশ্যাশ্রুপরীতনেত্রা
ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম্॥ ২।৭৬।২৩

অনন্তর ভরত দশ দিবস ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিলেন। দশ দিবস অতীত হইলে একাদশ দিবসে দশরথতনয় ভরত কৃতাশৌচ হইলেন, দ্বাদশ দিবসে ঋত্বিগ্‌গণ শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিলেন। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে মৃত রাজার পারলৌকিক মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অন্ন, ধন, রত্ন, ছাগ, গো, দাসদাসী ও গৃহ দান করিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে ভরত পিতার অস্থি সংগ্রহ করিবার জন্য শ্মশানে উপস্থিত হইলেন।

বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ॥
ত্রয়োদশোঽয়ং দিবসঃ পিতুর্বৃত্তস্য তে বিভো।
সাবশেষাস্থিনিচয়ে কিমিহ ত্বং বিলম্বসে॥ ২।৭৭।২১-২২

দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় পুত্র ভরত মৃত পিতার পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরে রামচন্দ্র ভরতের নিকট পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তুমি পাষাণপিষ্ট ইঙ্গুদীফল আনয়ন কর; নূতন চীরবসন সংগ্রহ কর, মহানুভব পিতার তর্পণাদির জন্য গমন করিব।"

আনয়েঙ্গুদিপিণ্যাকং চীরমাহর চোত্তরম্।
জলক্রিয়ার্থং তাতস্য গমিষ্যামি মহাত্মনঃ॥ ২।১০৩।২০

তর্পণের উদ্দেশ্যে সীতাকে পুরোভাগে উপস্থাপিত করিয়া রামলক্ষ্মণ মন্দাকিনী অভিমুখে গমন করিলেন। জলে অবতরণ করিয়া রামচন্দ্র পিতার নামগোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণজল প্রদান করিলেন। দক্ষিণমুখী হইয়া রামচন্দ্র জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উচ্চারণ করিলেন—

এতত্তে রাজশার্দ্দুল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্।
পিতৃলোকগতস্যাদ্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু॥ ২।১০৩।২৭

তর্পণ সম্পন্ন হইলে রামচন্দ্র পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলেন। এই পিণ্ড বদরীফলমিশ্রিত কুশ, তিল ও গন্ধদ্রব্য সংযুক্ত ইঙ্গুদীফল দ্বারা রচিত হইয়াছিল। পিণ্ডদান কালে রামচন্দ্র পিতার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "হে মহারাজ, আমাদিগের যাহা ভোজ্য, আপনি তাহাই ভোজন করুন।" মানুষ নিজে যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ ও দেবতাসকল তাহাই আহার করেন।

ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্ত্তো রুদন্ বচনমব্রবীৎ॥
ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ॥ ২।১০৩।২৯-৩০

দশরথের সৎকার ও শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন মানবের সৎকার ও শ্রাদ্ধের কোন উল্লেখ রামায়ণে নাই।

রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃতদেহের সৎকারের সম্বন্ধে কোন বিবরণ রামায়ণে নাই।

রামচন্দ্র বিরাধ রাক্ষসকে পরাজিত করিলেন। এই বিরাধ পূর্ব্বে তুম্বুরু নামধারী একজন গন্ধর্ব্ব ছিলেন। কুবেরের শাপে গন্ধর্ব্ববীর তুম্বুরু

বিরাধ রাক্ষসের প্রেতকৃত্য

রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়া বিরাধ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইলে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশে ভূনিম্নে গহ্বর খনন করিয়া বিরাধ রাক্ষসকে সেই ভূ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন। রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে, মৃত্যুর

পরে ভূ-গহ্বরে নিক্ষেপ করা রাক্ষসদিগের চিরন্তন ধর্ম্ম। মৃত্যুর পর যে সকল রাক্ষস ভূ-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারা সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকে।

রক্ষসাং গতসত্ত্বানামেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ॥ ৩।৪।২২

সুতরাং দেখা যায় যে, কোন কোন রাক্ষস শ্রেণীর মধ্যে মৃতদেহ প্রোথিত করার রীতি ছিল, কারণ উহা পারলৌকিক মঙ্গলার্থ বিহিত ছিল। রাক্ষসের মধ্যে মৃতদেহের সলিলসমাধি দানের প্রথাও ছিল। লঙ্কায় যুদ্ধের সময় রাবণের আদেশে মৃত রাক্ষসদিগকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

যে হন্যন্তে রণে তত্র রাক্ষসকুঞ্জবৈরঃ।
হতাহতস্তে ক্ষিপ্যন্তে সর্ব্বে এব তু সাগরে॥

সীতা অন্বেষণ করিতে করিতে রাম জটায়ুর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, পক্ষিরাজ জটায়ু দশরথের বন্ধু ছিলেন এবং সীতা উদ্ধার হেতু যুদ্ধে তিনি রাবণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, "এই পক্ষিরাজ আমার পিতৃবন্ধু, সুতরাং তিনি পিতৃতুল্য মাননীয় ও পূজনীয়। লক্ষ্মণ! তুমি কাষ্ঠ সংগ্রহ কর। আমি অগ্নি উৎপাদন করিয়া এই পক্ষিরাজের সৎকার করিব। কেননা, তিনি আমার হিতের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

জটায়ুর প্রেতকৃত্য

রামচন্দ্রের এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, পিতৃবন্ধুর পারলৌকিক কার্য্যে বন্ধুপুত্রের অধিকার ছিল এবং এই জাতীয় জীবদিগের দেহ অগ্নিতে দাহ করা হইত।

তারপর রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ কাষ্ঠদ্বারা চিতা রচনা করিলেন এবং রামচন্দ্র জটায়ুকে জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

এবমুক্ত্বা চিতাং দীপ্তামারোপ্য পতগেশ্বরম্।
দদাহ রামো ধর্ম্মাত্মা স্ববন্ধুমিব দুঃখিতঃ ॥ ৩৬৮।৩১

পরে তিনি মৃগমাংস দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া বৃহৎ কুশোপরি জটায়ুর উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ যে মন্ত্র জপ দ্বারা প্রেতের স্বর্গগমনে সাহায্য করেন, সেই মন্ত্র জপ করিলেন।

যত্তৎ প্রেতস্য মর্ত্ত্যস্য কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তৎ স্বর্গগমনং ক্ষিপ্রং তস্য রামো জজাপ হ॥ ৩।৬৮।৩৪

সুতরাং দেখা যায় যে, রামায়ণের যুগে মৃগমাংস দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করা হইত, দাহের অব্যবহিত পরে সদ্যসদ্যই প্রেতের উদ্দেশ্যে মন্ত্র জপ করা হইত। ব্রাহ্মণ আদি মানব এবং পক্ষী প্রভৃতি জাতির পারলৌকিক কার্য্য একই প্রথায় সম্পন্ন হইত। মৃত্যুর পরে মানব, রক্ষ, যক্ষ প্রভৃতি জাতির স্বর্গ এবং পারলৌকিক কার্য্যের ধারণা প্রায় একই প্রকার ছিল।

মন্ত্রজপ ও মৃগমাংস দ্বারা পিণ্ডদান সমাপ্ত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীতে গমন করিয়া জটায়ুকে জলদান করিলেন এবং উদক্-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তারপর শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে স্নান পূর্ব্বক জটায়ুর তর্পণ সমাপ্ত করিলেন।

ততো গোদাবরীং গত্বা নদীং নরেবরাত্মজৌ।
উদকং চক্রতুস্তস্মৈ গৃধ্ররাজায় তাবুভৌ॥
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা জলং গৃধ্রায় রাঘবৌ।
স্নাত্বা তৌ গৃধ্ররাজায় উদকং চক্রতুস্তদা॥ ৩।৬৮।৩৫-৩৬

জটায়ুর সৎকার, শবদাহ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ড, মন্ত্রজপ, তর্পণক্রিয়া হইতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, ভারতের সবব ত্রই পারলৌকিক বিশ্বাস একই প্রকার ছিল এবং একই প্রকার পারলৌকিক কার্য্য দ্বারা আত্মীয়-স্বজন মৃত ব্যক্তির প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিত।

এই ঘটনার পর রামচন্দ্রের সঙ্গে কবন্ধ দানবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই কবন্ধ দনুর পুত্র ছিলেন। সুতরাং তিনি দানব এবং স্থূলশিরা ঋষির অভিশাপে বিকট রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবন্ধ দানবের হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন।

কবন্ধের প্রেতকৃত্য

কবন্ধ বুঝিলেন, তাঁহার মৃত্যু নিকট। তিনি বলিলেন, "হে রামচন্দ্র! আপনি আমার দেহকে অগ্নিতে দাহ করুন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমাকে ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়া যথাশাস্ত্র দাহ করুন।"

তাবন্মামবটে ক্ষিপ্ত্বা দহ রাম যথাবিধি ॥
দগ্ধস্ত্বয়াহমবটে ন্যায়েন রঘুনন্দন ! ৩।৭১।৩১-৩২

লক্ষ্মণ চিতা প্রজ্বলিত করিলে অল্পে অল্পে দানব-রাক্ষস কবন্ধের শরীর দগ্ধ হইল।

সুতরাং দেখা যায় যে, দানব সম্প্রদায়ের মধ্যেও মৃতদেহের অগ্নিসৎকার বিধি ছিল। এই কবন্ধ অগ্নিসৎকারের পরে শাপবিমুক্ত হইয়া রামচন্দ্রকে বানররাজভ্রাতা সদাচারী সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করিবার পরামর্শ দিলেন। কারণ, সমদুঃখভাক্ সুগ্রীবের সাহায্য ব্যতীত রামচন্দ্রের পক্ষে সীতা-উদ্ধার সম্ভব নয়। পত্নীবিচ্যুত সুগ্রীব এবং রামচন্দ্রের অবস্থার সমতা ছিল। পরবর্তিকালে কবন্ধের উপদেশ সীতার উদ্ধারের পক্ষে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল।

বানররাজ বালীর মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে বলিলেন, "তুমি তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর সৎকারাদি অন্তিমকার্য্য সম্পাদন কর। তাঁহার সৎকারের জন্য বহু কাষ্ঠ ও সুবাসিত চন্দন সংগ্রহ কর। অঙ্গদ বিবিধ বস্ত্র, মাল্য, গন্ধদ্রব্য, ঘৃত, তৈল আনয়ন করুক।" তার নামক একজন বানর অমাত্য শিবিকা আনয়ন করিল; এই শিবিকা বর্ত্তমান যুগের মৃতদেহ-বহনোপযোগী সাময়িক প্রয়োজন সাধনের জন্য নির্ম্মিত বাহিকা নয়। উহা সিদ্ধগণের বিমানের অনুরূপ। উহাতে বিচিত্র পুষ্পমাল্যশোভিত, চিত্রাঙ্কিত জালযুক্ত বাতায়ন ছিল।

বানররাজ বালীর মৃতদেহ বহু অলঙ্কার, বস্ত্র, মাল্যদ্বারা ভূষিত করিয়া শিবিকায় স্থাপন করা হইল।

ততো বালিনমুদ্যম্য সুগ্রীবঃ শিবিকাং তদা।
আরোপয়ত বিক্রোশন্নঙ্গদেন সহৈব তু ॥
আরোপ্য শিবিকাঞ্চৈব বালিনং গতজীবিতম্।
অলঙ্কারৈশ্চ বিবিধৈর্মাল্যৈর্বস্ত্রৈশ্চ ভূষিতম্। ৪।২৫।২৮-২৯

বানরগণ মৃতদেহ নদীকূলে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বহন করিয়া আনিল; পথে মৃতদেহের সম্মুখে তাহারা নানাবিধ ধনরত্ন বিতরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। অঙ্গদ স্বয়ং পিতাকে চিতায় আরোহণ করাইলেন। তিনি মৃত পিতার মুখে শাস্ত্রবিধি অনুসারে অগ্নিপ্রদান করিলেন এবং দগ্ধ চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন।

বালীর প্রেতকৃত্য

সুগ্রীবেণ ততঃ সার্দ্ধং সোঽঙ্গদঃ পিতরং রুদন্।
চিতামারোপয়ামাস শোকেনাভিপ্লুতেন্দ্রিয়ঃ ॥
ততোঽগ্নিং বিধিবদ্দত্বা সোপসব্যং চকার হ।
পিতরং দীর্ঘমধ্বানং প্রস্থিতং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪।২৫।৪৯-৫০

তারপর অঙ্গদ, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজন মিলিত হইয়া নদী সলিল উদকক্রিয়া সমাপণ করিলেন। বানর সমাজে নারীগণ পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করিতেন। সুগ্রীব, তারা ও অন্যান্য বানরগণ অঙ্গদকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া বানর রাজের অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ততস্তে সহিতাস্তত্র অঙ্গদং স্থাপ্য চাগ্রতঃ।
সুগ্রীবতারাসহিতাঃ সিষিচুর্বানরা জলম্ ॥ ৪।২৫।৫১

বালীর শ্মশানকার্য্যের উল্লেখ রামায়ণে আছে, কিন্তু তাঁহার শ্রাদ্ধের বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। এই সৎকারের মধ্যে দেখা যায়, মৃতদেহকে চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত চিতামধ্যে স্থাপন করা হইত। মৃতদেহ বহনের সময় পথে পথে ধনরত্ন বিতরণ করা হইত। পুত্র মৃতদেহের মুখে অগ্নিসংযোগ করিত। শবদাহন সমাপ্ত হইলে নদীসলিলে উদকক্রিয়া সমাপ্ত করিত। নারীগণও পারলৌকিক ক্রিয়াতে যোগদান করিত।

জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতি তাঁহার মৃত ভ্রাতার উদকক্রিয়া বরুণালয়ে সমুদ্রতীরে সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

সমুদ্রং নেতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বরুণালয়ম্।
প্রদাস্যাম্যুদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪।৫৮।৩৫

বহু রাক্ষস ও বানরবীর লঙ্কাযুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তাহাদের মৃতদেহ সৎকারের কোন সংবাদ রামায়ণে নাই। মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হইলে রাবণ স্বয়ং তাঁহার প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ইন্দ্রজিতের পারলৌকিক কার্য্য সম্বন্ধে রামায়ণে কোন বিশেষ বিবরণ নাই। কেবল একমাত্র রাবণ তাঁহার বিলাপের অবসরে বলিয়াছিলেন, "হে বীরপুত্র! কোথায় আমি যমালয়ে গমন করিলে তুমি আমার প্রেতকার্য্য করিবে, তাহা না করিয়া আমাকেই তোমার প্রেতকার্য্য করিতে হইল।"—অর্থাৎ পিতা হইয়া পুত্রের প্রেতকার্য্য রাবণ সম্পন্ন করিলেন। ইহা রাক্ষসরাজের পক্ষে আক্ষেপের বিষয়।

মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসদনম্।
প্রেতকার্য্যাণি কার্য্যাণি বিপরীতে হি বর্ত্তসে ॥ ৬ ৯৩।১৪

এইখানে দেখা যায় যে, রাক্ষস সমাজে পিতা অবস্থাবিশেষে পুত্রের পারলৌকিক কার্য্যের অধিকারী হইতেন। রাক্ষসরাজ রাবণের প্রেতকৃত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ রামায়ণে উল্লেখ আছে। রাবণ নিহত হইলে

রাবণের প্রেতকৃত্য

রামচন্দ্র শোকার্ত্ত বিভীষণকে বলিলেন, "যাহারা জয়ের আশায় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক সম্মুখ রণে প্রাণ বিসর্জ্জন করে তাহাদের নিমিত্ত শোক করা উচিত নয়।—প্রাচীনগণ সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়োচিত গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব ক্ষত্রিয়বীর রণমধ্যে নিহত হইলে তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নহে।"

নৈবং বিনষ্টাঃ শোচ্যন্তে ক্ষত্রধর্ম্মব্যবস্থিতাঃ।
বৃদ্ধিমাশংসমানা যে নিপতন্তি রণাজিরে ॥
ইয়ং হি পূর্ব্বৈঃ সন্দিষ্টা গতিঃ ক্ষত্রিয়সম্মতা।
ক্ষত্রিয়ো নিহতঃ সংখ্যে ন শোচ্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৬।১১১।১৫,১৮

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, রাবণ রাক্ষস সমাজভুক্ত হইলেও ক্ষত্রিয় ছিলেন (?) এবং ক্ষত্রিয়রীতি অনুযায়ী তাঁহার সৎকারকার্য্য সম্পন্ন

করা হইয়াছিল। বিভীষণ বলিলেন, "রাবণ ছিলেন আহিতাগ্নি, মহাতেজস্বী, বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।"

এই বাক্য দ্বারা বিভীষণ বলিতে চাহিলেন—রাক্ষসরাজ রাবণের সৎকার যথাবিধি সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

এষোহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ বেদান্তগঃ কর্ম্মসু চাগ্র্যশূরঃ।
এতস্য যৎ প্রেতগতস্য কৃত্যং তৎ কর্ত্তুমিচ্ছামি তব প্রসাদাৎ॥
৬।১১১।২৩

বিভীষণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক দশাননের অগ্নিহোত্র পাত্র আনয়ন করিলেন। অচিরকালমধ্যে শকট, দারুপাত্র, চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ, গন্ধদ্রব্য, মণিমুক্তা, প্রবাল এবং অগ্নি সংগ্রহ করিলেন।

স প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
রাবণস্যাগ্নিহোত্রন্তু নির্যাপয়তি সত্বরম্॥
শকটান্ দারুপাত্রাণি অগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা।
তথা চন্দনকাষ্ঠানি কাষ্ঠানি বিবিধানি চ॥
অগুরূণি সুগন্ধীনি গন্ধাংশ্চ সুরভীংস্তথা।
মণিমুক্তাপ্রবালানি নির্যাপয়তি রাক্ষসঃ॥ ৬।১১৩।১০৩-১০৫

এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনয়ন করা হইলে রাবণের মাতামহ মাল্যবানের সহযোগে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল। রাক্ষস-রাজকে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করাইয়া সুবর্ণময় দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইলেন। সেই শিবিকা বিচিত্র মাল্য ও পতাকায় সুশোভিত করা হইল। ব্রাহ্মণ রাক্ষসগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। এইখানে দেখা যায় যে, রাক্ষসের মৃতদেহকে নববস্ত্র পরিধান করান হইত। রাজা দশরথ এবং বানররাজ বালীকেও নূতন বস্ত্র পরিধান করান হইয়াছিল। রাক্ষসের পক্ষেও পারলৌকিক কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল এবং ইহা স্বয়ং বাল্মীকি উল্লেখ করিয়াছেন।

সৌবর্ণীং শিবিকাং দীব্যামারোপ্য ক্ষৌমবাসসম্।
রাবণং রাক্ষসাধীশমশ্রুপূর্ণমুখা দ্বিজাঃ॥ ৬।১১৩।১০৭

তারপর রাবণের মৃতদেহ বেদোক্ত বিধি অনুসারে দাহের জন্য চন্দনকাষ্ঠ, পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), উশীর ও চন্দন দ্বারা অগ্নিকোণে চিতা নির্ম্মাণ করা হইল। ঋত্বিক্‌গণ বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক যথাস্থানে অগ্নিস্থাপন করিলেন। রাক্ষসরাজের পিতৃমেধবিহিত কর্ম্ম সমাপন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ মৃতদেহের স্কন্ধদেশে দধি ও আজ্যপূর্ণ (ঘৃতপূর্ণ) স্রুব (কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র), পদদ্বয়ে শকট, উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে উদূখল এবং অরণি, উত্তর অরণি এবং অন্যান্য দারুপাত্রসকল যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। শাস্ত্র বিধান অনুসারে মেধ্য পশুহনন পূর্ব্বক তাঁহার চর্ম্মদ্বারা রাক্ষসরাজের মুখ আবৃত করিলেন *। তারপর রাক্ষসরাজের দেহ গন্ধদ্রব্য, মাল্য এবং বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অলঙ্কৃত-দেহের উপরে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। সর্ব্বশেষে বিভীষণ যথাবিধি চিতায় অগ্নি প্রদান করিলেন।

রাবণং প্রয়তে দেশে স্থাপ্য তে ভৃশদুঃখিতাঃ।
চিতাং চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ॥
ব্রাহ্ম্যা সংবর্ত্তয়ামাসু রোঙ্কবাস্তরণাবৃতাম্।
প্রচক্রু রাক্ষসেন্দ্রস্য পিতৃমেধমনুত্তমম্॥
বেদীঞ্চ দক্ষিণাপ্রাচীং যথাস্থানঞ্চ পাবকম্।
পৃষদাজ্যেন সম্পূর্ণং স্রুবং স্কন্ধে প্রচিক্ষিপুঃ॥
পাদয়োঃ শকটং প্রাদাদন্তরূর্ব্বোরুলূখলম্॥
দারুপাত্রাণি সর্ব্বাণি অরণিঞ্চোত্তরারণিম্।
দত্ত্বা তু মুষলং চান্যং যথাস্থানং বিচক্রমুঃ॥
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ।
তত্র মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ॥
পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন্।
গন্ধৈর্ম্মাল্যৈরলঙ্কৃত্য রাবণং দীনমানসাঃ॥
বিভীষণসহায়াস্তে বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি।
লাজৈরবকিরন্তি স্ম বাষ্পপূর্ণমুখাস্তদা॥ ৬।১১৩।১১২-১১৯

শবদাহান্তে শ্মশানবন্ধুগণ স্নান সমাপ্ত করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে বিধিপূর্ব্বক তিল ও কুশ মিশ্রিত উদকাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভবিমিশ্রিতান্॥
উদকেন চ সংমিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্ব্বকম্। ৬।১১৩।১২০-১২১

* ঋগ্বেদের যমসূক্তে এ প্রেতকার্য্যের জন্য পশু বধের ব্যবস্থা ছিল।

রামায়ণে বর্ণিত সৎকার এবং শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য্য বিশ্লেষণ করিলেন দেখা যায় যে, মানব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পক্ষী, প্রভৃতি জাতির পরলোকে বিশ্বাস ছিল। মৃতদেহের সৎকারের উপর ঔর্দ্ধ দৈহিক গতি নির্ভর করে বলিয়া এই সমস্ত জাতি বিশ্বাস করিত। শবদেহকে, দাহন জলে নিক্ষেপণ, ভূমিতে প্রোথিত করার প্রথাই প্রশস্ত ছিল। মানবরাজ দশরথ, শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব্ব বিরাধ, পক্ষিরাজ জটায়ু, বানররাজ বালী এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে দাহ করা হইয়াছিল। শাপগ্রস্ত দানব কবন্ধকে ভূ-নিম্নে প্রোথিত করা হইয়াছিল। লঙ্কায় নিহত রাক্ষসগণকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

শববহনের সময় ধনরত্নাদি বিতরণ করা হইত। শবদেহ বহনের জন্য শিবিকা ব্যবহৃত হইত। দাহকার্য্যের জন্য চিতা, চিতার জন্য চন্দনকাষ্ঠ, অগুরু, মাল্য, গুগগুল্ ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত। দশরথ, বালী এবং রাবণের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করা হইয়াছিল। জটায়ু এবং কবন্ধকে বনমধ্যে দাহ করা হইয়াছিল, কারণ, বনবাসী রামের দ্বারা শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যসংগ্রহের উপায় ছিল না।

চিতায় অগ্নিসংযোগের নিমিত্ত পরিবারের জন্য সদারক্ষিত অগ্নিই ব্যবহার করা হইত। দশরথের ও রাবণের জন্য গৃহে সংরক্ষিত অগ্নিহোত্র পাত্র হইতে সংগৃহীত অগ্নি ব্যবহৃত হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র, জ্যেষ্ঠের অভাব অন্যপুত্র, পুত্রের অভাবে পিতা (রাবণ মেঘনাথের কার্য্যে), বন্ধুপুত্র (জটায়ুর কার্য্যে রাম) ও ভ্রাতা (রাবণের প্রেতকার্য্যে ভ্রাতা বিভীষণ) ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের অধিকারিরূপে রামায়ণে উল্লিখিত আছে। অগ্নিসংযোগের পরেই পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে মন্ত্রজপ করা হইত। দশরথ ও রাবণের প্রেতকার্য্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মন্ত্র জপ করা হইয়াছিল। ঋত্বিক্, পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ শ্মশানকার্য্য সমাধা করিতেন। শ্মশানে হোম করার বিধি ছিল। দশরথের শ্মশানে হোম করা হইয়াছিল।

দগ্ধ চিতা প্রদক্ষিণ করার রীতি ছিল। নারী ও ঋত্বিগগণ

দশরথের চিতা প্রদক্ষিণ করেন। অঙ্গদ বালীর চিতা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। বিভীষণ ও পুরনারীগণ রাবণের চিতা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। নারীর শ্মশান-কার্য্যে উপস্থিতি বিধিসম্মত ছিল।

মেধ্য পশু হনন করিয়া উহার চর্ম্মদ্বারা রাবণের শবদেহের মুখকে আবৃত করা হইয়াছিল (৬।১১৩।১১৭)। রাবণের শবদেহের মতন অন্য কাহারো দেহকে আবৃত করা হয় নাই। বস্ত্রখণ্ড দ্বারা দশরথের দেহ, বালীর দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হয়। রাবণের মৃতদেহকে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করান হয়।

ক্ষত্রিয়গণ মৃত্যুর পর দশ দিবস অশৌচ পালন করিত। একাদশ দিবসে অশৌচান্ত হইত। দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণকে দান করা হয় (২।৭৭।২১)। ত্রয়োদশ দিবসে শবের অস্থি সংগ্রহ করার রীতি ছিল (২।৭৭।২২)। বালী বা রাবণের শ্রাদ্ধবিষয়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। মৃতের সৎকারের পর পিণ্ডদান করা হইত। জটায়ুর (মৃগ মাংস দ্বারা) পিণ্ডদান করা হইয়াছিল, দশরথের পিণ্ডদান করা হইয়াছিল বদরী, তিল ও ইঙ্গুদীফল দ্বারা (২।১০৩।২৯)। জল দ্বারা তর্পণ-বিধি মানব, বানর এবং রাক্ষসদের মধ্যে যেমন দেখা যায়; যেমন জটায়ুর জন্য তাঁহার ভ্রাতা সম্পাতি এবং রামচন্দ্র স্বয়ং জলতর্পণ করিয়াছিলেন (৪।১১।৩৬)। তর্পণের জন্য নদীতীর প্রশস্ত স্থান ছিল। ভরত কর্ত্তৃক দশরথের উদক্‌ক্রিয়া সরযূতীরে সম্পন্ন হইয়াছিল (২।৭৬।২২)। রামচন্দ্র দশরথের উদক্‌ক্রিয়া মন্দাকিনী তীরে সম্পন্ন করেন (২।১১৩।২৮)। জটায়ুর উদক্‌ক্রিয়া রামচন্দ্র কর্ত্তৃক গোদাবরী তীরে সম্পন্ন হইয়াছিল (৩।৬৯।৩৫)। তাঁহার ভ্রাতার উদক্‌ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য সম্পাতিকে বরুণালয়ে সমুদ্রতীরে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাবণের শ্মশানকার্য্য সমাপ্ত হইলে বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই স্নান করিয়াছিলেন। মানব, রাক্ষস, বানর প্রভৃতি পারলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তাহাদের সভ্যতার ঐক্য প্রমাণ করে।

উপসংহার

নবম অধ্যায়

রাবণ চরিত্র

বাল্মীকি বর্ণিত রামায়ণে রাক্ষসরাজ রাবণের চরিত্রের মাধ্যমে রাক্ষসসভ্যতার পরিপূর্ণ রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। রাবণের জন্মবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণের তপস্যা, ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ, লঙ্কাধিকার, দিগ্বিজয়, সীতাহরণ, রাম-রাবণ যুদ্ধ, রাবণের পরাজয় ও প্রেতকৃত্য পর্য্যন্ত প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে আমরা রাক্ষস জীবনের বিভিন্ন দিকের সন্ধান পাই। জন্মে রাবণ মনুর বংশসম্ভুত, তাঁহার পিতৃকুলে ছিলেন পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা, মাতৃকুলে সুমালী রক্ষকন্যা কৈকসী। রাবণের পিতা মানবজাতীয়, মাতা রাক্ষসজাতীয়া।

সুতরাং রাবণের চরিত্রে ঋষিজনোচিত এবং রাক্ষসোচিত স্বভাব ও গুণ সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রাবণ শৈশবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন, বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তপশ্চর্য্যা যাগযজ্ঞ দেবার্চ্চনা ইত্যাদি পুণ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। মাতার আদেশ এবং মাতৃ-ইচ্ছা পূরণের জন্য রাবণ দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। যৌবনে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। মাতামহ সুমালী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও প্রথমে রাবণ বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের বিরুদ্ধে বৈরীভাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য কুবের বিনা যুদ্ধে লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন করিলে রাবণ লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে রাবণের কার্য্যে দুইটি দিক প্রকাশ পাইয়াছে—প্রথমতঃ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, দেবতার বরে যুদ্ধে অপরাজেয়তা এবং অমরত্ব ইহলোকে লাভ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রথম হইতেই মনুষ্যকে হীনজীব বলিয়া বিবেচনা করিতেন; সেইজন্য তিনি ব্রহ্মার নিকট মনুষ্যের বিরুদ্ধে কোন দৈবানুগ্রহ যাচ্ঞা করেন নাই। রাক্ষসেরা

স্বয়ং যাগযজ্ঞ তপস্যা দ্বারা শক্তিলাভ করিবে, কিন্তু অন্য কেহ যাগযজ্ঞ দ্বারা দেবানুগ্রহ লাভ করিবে—ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারিত না। সুতরাং দেবতা বা মানব তপস্যা এবং যাগযজ্ঞ করিলে রাক্ষসেরা উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। এই কারণে স্বর্গে দেবতারা রাবণ ও রাক্ষসদের কার্য্যের বিরুদ্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং রাবণের নিধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কুবের তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের নিকট দেবতাদের মনোভাব ও কার্য্যের সংবাদ প্রদানের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কুবেরের দূত কুবেরের প্রতিনিধিরূপে লঙ্কাধিপতি রাবণকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া দেবতাদের সংকল্প জ্ঞাপন করিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাবণের ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক এবং রাবণ সহজভাবেই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কুবের দেবতাদেব সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন। সুতরাং কুবেরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাবণ কৈলাসে অভিযান করিলেন। এই অভিযান আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার পূর্ব্বেই রাবণ সমস্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ময়দানব এবং হেমা অপ্সরার কন্যা মন্দোদরীকে অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ করেন। বিরোচন বলী দানবের দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ দেন। রাবণ ভগিনী শূর্পণখার সঙ্গে কালকেয় দানব বিদ্যুজ্জিহ্বের বিবাহ হয়। পরে তিনি হিমালয়নিবাসী গন্ধর্ববরাজ শৈলূষের কন্যা সরমার সঙ্গে বিভীষণের বিবাহ দেন। ইহা হইতে মনে হয় দেবতা, মানব বা বানর ভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে রাবণ সহজভাবেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেন; কিন্তু রাজবংশ ভিন্ন সাধারণ বংশের সহিত কোন বৈবাহিক আদান প্রদান করেন নাই। বলপূর্ব্বক অপহৃতা হইলেও শেষ পর্য্যন্ত মধু দৈত্যের সঙ্গে রাবণের মাতৃষ্বসা ভগ্নী কুম্ভীনসীর বিবাহ হয়।

দিগ্বিজয় উপলক্ষে নির্গত হইয়া রাবণ হিমালয়ের অপর প্রান্ত পাতাল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই অভিযান করিয়াছেন। এই অভিযানে

রাবণ শঙ্কর ভিন্ন প্রায় সকল দেবতা, দ্বীপময় রাজ্যের অধিপতি মান্ধাতা, হৈহয়রাজ অর্জ্জুন ব্যতীত সকল মানবরাজ এবং কিষ্কিন্ধ্যাপতি বানররাজ বালী ভিন্ন সকলের বিরুদ্ধেই জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধান্তে বহু দেবকন্যা, রাক্ষসকন্যা, নাগকন্যা হরণ করিয়াছেন। বোধ হয়, সেই যুগে যুদ্ধে পরাজিতা বা অপহৃতা রাজকন্যা বিজেতার সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। বাল্মীকি বলিয়াছেন, অপহৃতাদের মধ্যে অনেকেই রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও পুলোমা দৈত্যের কন্যা শচীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র, বরুণ, পবন, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা অপ্সরা, যক্ষ, মানব ও ঋক্ষকন্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন। রাবণ যদি এই সমস্ত পরাজিত শত্রু কন্যা হরণ করিয়া থাকেন এবং অপহৃতাদের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকেন, তবে উহা সমসাময়িক সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ বলা সমীচীন হইবে না। বরঞ্চ এই সমস্ত বিবাহ ও যৌন সম্বন্ধের প্রচ্ছদপটে একটি সর্ব্বভারতীয় সমজাতিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

রাবণ ও রাক্ষস পরিবারের নাম সংস্কৃত হইতে গৃহীত। রাবণের বেদমন্ত্র উচ্চারণ, বেদাচার, যাগযজ্ঞ এবং তপস্যা আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, রাক্ষসের সভ্যতার পশ্চাতে একটি সর্ব্বভারতীয় ভিত্তি ছিল। অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ এবং মিত্রতা স্থাপন করা, সামাজিক ভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদ্যার্ঘ্য গ্রহণ ও শুভকার্য্যে গুরুজনকে প্রদক্ষিণ করা ইত্যাদি কর্ম্ম দ্বারা রাক্ষসদের মধ্যে একটি সর্ব্বভারতীয় সামাজিক রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। রাজকার্য্যের মধ্যে অভিষেক, মন্ত্রপাঠ, উপচার, যুদ্ধারম্ভে দেবার্চ্চনা, শুভ দিনক্ষণ অনুসরণ করা ইত্যাদি কার্য্যের মধ্যে একটি সর্ব্বভারতীয় সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। মানব ও রাক্ষসের মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধরথ, যুদ্ধরীতি—প্রভৃতি ব্যাপার প্রায় একই রূপ ও রকম ছিল।

তবে রাক্ষসের বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতি আলোচনা করিলে যুদ্ধরীতি ও যুদ্ধকৌশলের মধ্যে মায়াবিদ্যার প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বানর, যক্ষ, রক্ষ,

অপ্সরা প্রভৃতি গোষ্ঠী মায়ারূপ ধারণ করিতে পারিত। মানুষের সেইরূপ মায়াবিদ্যা আয়ত্ত ছিল না। রাক্ষস মায়াযুদ্ধ করিতে পারিত, মানুষ তাহা পারিত না। রাবণের সৈন্যদের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষ কোন উল্লেখ নাই—বানর সৈন্যের মধ্যে জাম্বুবান প্রভৃতি চিকিৎসকের উল্লেখ আছে।

দেবতা, ঋষি, যক্ষ, অপ্সরা, নাগ প্রভৃতি জাতি অভিশাপ দিতে পারিত, কিন্তু রাক্ষস কাহাকেও অভিশাপ দিয়াছে বলিয়া উল্লেখ নাই।

সীতাহরণের প্রচ্ছদপটে রাবণের চরিত্র বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়া থাকে। নিরপরাধ সীতা ছদ্মবেশী অতিথি রাবণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলে রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া অন্যায়কে অন্যায়তর করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু রাবণের পক্ষে কোন যুক্তি কি ছিল না? রাজনীতির দিক দিয়া দণ্ডকারণ্য রাবণের রাজ্যান্তর্গত ছিল। সেখানে তাঁহার ভগ্নী শূর্পণখা এবং আত্মীয় খরদূষণের অধীনে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য রক্ষা করিত। রামচন্দ্র বিনা অনুমতিতে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, বাস করিয়াছেন; উহাতে রাক্ষসের পক্ষ হইতে কোন নিষেধ আরোপিত হয় নাই। কিন্তু রাক্ষস-রাজের ভগিনী শূর্পণখা লক্ষ্মণ কর্তৃক বিরূপিতা হইয়াছিলেন, রাক্ষস সেনাপতি ও সেনা নিহত হইয়াছিলেন—সুতরাং রাক্ষস-রাজের পক্ষে রাজ-ভগিনীর অপমানকারীকে এবং রাজ্য-শত্রুকে শাস্তি প্রদান করা রাজনীতি অনুমোদিত প্রথা। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে ছল, বল, কৌশল প্রভৃতি যুদ্ধের অঙ্গ এবং সমর্থনযোগ্য নীতি। রাবণের সেনাপতি অকম্পন সহজে সুলভে রামের শক্তি নষ্ট করিবার উপায় বলিলেন। সে উপায় ছিল সীতাহরণ। কারণ, সীতাই ছিলেন রামের শক্তির উৎস।

> তস্যাপহর ভার্য্যাং ত্বং তং প্রমথ্য মহাবানে।
> সীতয়া রহিতো রামো ন চৈব হ ভবিষ্যতি॥ ৩৩১।৩১

যুদ্ধ অপেক্ষা কৌশলে শত্রুর শক্তিলোপ করার মধ্যে সহজ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে কোন অন্যায় ছিল না।

রাবণ সীতাহরণের জন্য দণ্ডকারণ্যে মারীচের সাহায্য যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু প্রথমে মারীচের পরামর্শে রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে শূর্পণখা ভ্রাতার দুর্ব্বল অংশে আঘাত করিয়া সীতা-হরণে রাবণকে উত্তেজিত করিলেন। রাবণের ভগিনী শূর্পণখা অপমানিতা হইয়াছেন—সুতরাং রামচন্দ্রের পত্নীকে অপহরণ বা অপমান করিয়া রাবণ সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। নিজ ভগিনীর অপমানে শত্রুর স্ত্রীহরণ অতি অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। দ্বিতীয়তঃ শূর্পণখা জানিতেন যে, রাবণের নারী-দেহের প্রতি একটা সহজ দুর্ব্বলতা ছিল। সুতরাং সীতার সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া শূর্পণখা রাবণকে সীতার প্রতি আকৃষ্ট করিলেন। সীতাহরণ করিবার জন্য রাবণ দ্বিতীয়বার মারীচের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। স্বর্ণমৃগরূপে মারীচ রামকে ছলনা করিয়াছেন; সন্ন্যাসীরূপে রাবণ সীতাকে ছলনা করিয়াছেন, রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুকে নিধন করিয়াছেন। এই সমস্ত ঘটনায় পাঠকের মনে সীতার প্রতি সহজ সহানুভূতি এবং রাবণের প্রতি সহজ ঘৃণার উদ্রেক করে।

রাবণ সীতার দেহ নষ্ট করেন নাই। সমগ্র রামায়ণের মধ্যে নারীর সঙ্গে রাবণের ব্যভিচারের তিনটি উল্লেখ পাওয়া যায়। অপ্সরা রম্ভা, ও পুঞ্জিকস্থলা এবং ঋষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী। অপ্সরার কোন পতি নাই, তাহারা কামভোগ্যা; তবু রম্ভাকে ধর্ষণের অপরাধে যক্ষ নলকুবের রাবণকে অভিশাপ দিলেন—"অকামা নারীকে ধর্ষণ করিলে তোমার মস্তক সপ্তধা চূর্ণ বিদীর্ণ হইবে।" পুঞ্জিকস্থলাকে ধর্ষণ করার অপরাধে ব্রহ্মা অভিশাপ দিলেন—রাবণ যদি বলপূর্ব্বক কোন নারীকে ধর্ষণ করে তবে তাঁহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। রাবণ ঋষিকন্যা বেদবতীকে কেশাকর্ষণ করিয়া অপমান করিয়াছিলেন। অপমানে বেদবতী অনলমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। সেই সময় তিনি রাবণকে অভিশাপ দিলেন যে, আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার বধের নিমিত্ত হইব।

বাল্মীকি এই সমস্ত অভিশাপের অন্তরালে সীতার দেহের পবিত্রতা

রক্ষা করিয়াছেন। রাবণকে কামাতুর রূপে চিত্রিত করিয়া পরোক্ষে তাঁহার সংযমের প্রমাণ দিয়াছেন। রাবণের সীতাহরণ কার্য্যকে প্রহস্ত, বিভীষণ, ধন্যমালিনী, মন্দোদরী প্রভৃতি রাক্ষস রাক্ষসীগণ নিন্দা করিয়াছেন। রাবণ ইচ্ছা করিলে সীতার দেহ নষ্ট করিতে পারিতেন, সীতাকে হত্যা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি উহা করেন নাই। এই দুইটির যে কোন একটি কার্য্য করিলে রাবণ আরও ঘৃণ্যতর হইতেন।

ধর্ম্মের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে রাবণের চরিত্র অপূর্ব্ব। তিনি মাতৃ আদেশ পালনের জন্য দশ সহস্র বৎসর নিশ্ছিদ্র তপস্যা করিয়াছেন। শরবণে বিপত্তি সৃষ্টি করার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শঙ্করের নিকট সহস্র বৎসর অনুতাপ করিয়াছেন, নর্ম্মদাতীরে পুণ্যস্নান ও শিবার্চ্চনা করিয়াছেন। রাবণের রাজত্বে লঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হোম যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন এবং পারিবারিক অনুষ্ঠান-রূপে নানা যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাবণের দেবদ্বিজে ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তিনি স্বয়ং যাগ, যজ্ঞ, পূজা, উপাসনা ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিতেন। শত বিপদ সত্ত্বেও তিনি কখনও ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, রাবণের চরিত্র এবং ধর্ম্মবিশ্বাস রাক্ষস প্রজাবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। হনুমান প্রভাতে রাক্ষসগৃহে বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, মুণ্ডিত মস্তক অজিন চর্ম্মধারী সদাচারী সন্ন্যাসীকে লঙ্কার পথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছেন। বিভীষণ রাজ-দর্শনের অভিলাষে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া বেদ-মন্ত্রধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন। লঙ্কানগরীতে একদিকে যেমন ভোগের চরম দৃষ্টান্ত লক্ষ্য হয়, অন্যদিকে তেমন একটি ধর্ম্মের পরিবেশও ছিল। লঙ্কার পূজাবেদী, যজ্ঞাগার, হোমকুণ্ড, পুণ্যবৃক্ষ, চৈত্যগৃহ ছিল। লঙ্কা-পুরীর সর্ব্বত্র একটা ধর্ম্মীয় আবেষ্টনী ছিল। অবশ্য রাজ্যের অধিপতি যদি ধর্ম্মহীন বা ধর্ম্মবিদ্বেষী হইতেন, তবে সমাজে কিম্বা রাজপুরীতে এইরূপ ধর্ম্মভাব সূচিত হইত না।

লঙ্কায় নানা শ্রেণী এবং নানা জাতির বাস ছিল। রাবণের শাসনে

একদিকে যেমন লঙ্কার ঐশ্বর্য্য, অন্যদিকে তেমনি সদা সন্তুষ্ট প্রজাবর্গও ছিল। হনুমান লঙ্কায় 'হৃষ্ট মানব' দর্শন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাবণের প্রজাদের মধ্যে মানুষ ছিল, অন্য দিকে রাক্ষসও মনুষ্যশাসিত রাজ্যে অবস্থান করিত। সাধারণতঃ যাগযজ্ঞ ব্যাপারে রাক্ষস এবং মানবের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও বিবাদ ছিল। রাবণের রাজ্যে একাধিনায়কত্ব সত্ত্বেও মন্ত্রণাসভা এবং মন্ত্রণায় তর্কবিতর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজসভায় অপ্রিয় আলোচনাও হইত। রাজসভায় নারীর প্রবেশ নিষেধ ছিল না। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় প্রতিদিন পিতা পুত্রহীন হইয়াছে, পুত্র পিতৃহীন হইয়াছে, ভ্রাতা ভ্রাতৃহীন হইয়াছে, আত্মীয় আত্মীয়হীন হইয়াছে। কিন্তু অত দুর্দ্দৈব সত্ত্বেও কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লবের কথা শোনা যায় নাই, যুদ্ধ বিরতি কিম্বা সন্ধির প্রস্তাব কেহ উচ্চারণ করে নাই। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রাবণের বিরুদ্ধে কোন প্রজার মুখে অসন্তোষের বাণী উচ্চারিত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, রাবণের শাসনে প্রজাকুল সন্তুষ্ট ছিল। প্রজারঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র সীতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহার পত্নীদের প্রতি সেইরূপ রূঢ় ব্যবহার করেন নাই।

রাবণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রাবণ মনুষ্য জাতীয় কিন্তু ভিন্ন গোষ্ঠী-ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সমাজ-ব্যবস্থা সুসংবদ্ধ ছিল। তাঁহার জীবনের নৈতিক ভিত্তি ছিল; অবশ্য রাক্ষসের নীতিজ্ঞানের সঙ্গে মানবের নীতিজ্ঞান কতকগুলি বিষয়ে পৃথক ছিল। উপাস্য, উপাসনা, যাগযজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ইত্যাদি মানব এবং রাক্ষসের সমাজে প্রায় একই রূপ ছিল। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা বিচারে রাক্ষসেব সভ্যতা উত্তর ভারতীয় মানবসভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। বরং যুদ্ধকলায় ও কৌশলে এবং নানা শিল্প বিদ্যায় রাক্ষসগণ অধিকতর পারদর্শী ছিল। লঙ্কায় রাবণের রাজ্যব্যবস্থা সুদৃঢ় ছিল। এবং লঙ্কার বাহিরে রাজ্যাংশে অনেকটা স্বায়ত্ত্বশাসন ছিল। বিদেশে রাজ্যজয় করিয়া রাক্ষসগণ পরাজিত শত্রুকে রাজ্যচ্যুত করেন নাই।

অযোধ্যার সাম্রাজ্য সর্ব্বভারতে অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের কিষ্কিন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই যুক্তিতে রামচন্দ্র দুশ্চরিত্র বালীবধরূপ গর্হিত কার্য্য সমর্থন করিয়াছেন। বোধ হয়, রাক্ষস এবং মানবের মধ্যে রাজ্য-বিস্তারকে কেন্দ্র করিয়া একটা প্রতিযোগিতাও ছিল। অবশ্য রামচন্দ্র লঙ্কার উপর আধিপত্য দাবী করেন নাই—যদিও রাবণ ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাপতি অনরণ্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ভারতের প্রায় সমস্ত অংশই তিনি জয় করিয়াছিলেন। রাবণ হিমালয়ের অলকা-পুরী হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশের রাজ্যগুলি, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের এবং পাতালেও সমুদ্রের অন্তর্গত রাজ্যগুলি জয় করিয়াছিলেন। শৌর্য্যে বীর্য্যে মান্ধাতা এবং হৈহয়রাজ অর্জ্জুনের হস্তে রাবণ পরাজিত হইয়াছিলেন। সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে মনে হয় যে, তখন ভারতে দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, নর, বানর, কিন্নর, খগ, নাগ, দৈত্য, দানব, অসুর প্রভৃতি নানা প্রকার গোষ্ঠী ছিল। তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান হইত। গোষ্ঠী বিচারে দেখা যায় যে, একদিকে যেমন রাক্ষসদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল, অন্যদিকে তেমন বান্ধবতাও ছিল। সাধারণতঃ মানুষ, দেবতা এবং যক্ষ এক পক্ষ অবলম্বন করিত। অন্য-দিকে পিশাচ, অসুর, দৈত্য, দানবগণ সাধারণতঃ দেবতা ও মানবের বিপক্ষ ছিল। বোধ হয় তখনও ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর বসতি সম্পূর্ণভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই। ইহার জন্যই বোধ হয় রামায়ণের অর্থ **রামস্য অয়নম্** অর্থাৎ গমনম্, অর্থাৎ উত্তর ভারত হইতে রামচন্দ্রের পূর্ব্ব ভারতে গমন, রাজর্ষি জনকের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন, মধ্যভারতে গুহক চণ্ডালের সহিত মৈত্রী স্থাপন, দণ্ডকারণ্যে আশ্রম নির্ম্মাণ, কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন—পরিশেষে রাক্ষস বিভীষণের বান্ধবতা, লঙ্কা বিজয় এবং বিভীষণকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা এবং রামচন্দ্রের উত্তর ভারতে প্রত্যাগমন ইত্যাদি ঘটনা দ্বারা রামচন্দ্রের সর্ব্বভারতে আর্য্য সভ্যতা প্রচারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। রাক্ষসদের বিষয় অবতারণা করিবার সময় উত্তর

ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার প্রতীক মহর্ষি বাল্মাকি রামচন্দ্রের গুণ কীর্ত্তনের অন্তরালে রাবণের চরিত্রকে হীনপ্রভ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু স্থলবিশেষে তিনি রাবণকে মহাশক্তিশালী, মহা-তেজস্বা, মহাবীররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। রাবণকে এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিবার কারণ কি? হয়, রাবণ এইরূপ গুণসম্পন্ন ছিলেন, নচেৎ রাবণের গুণকীর্ত্তন দ্বারা পরোক্ষে রামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছেন। কারণ, রাবণের মতন মহাবীরকে পরাজিত করিয়া রামচন্দ্র স্বীয় বীরত্বই প্রমাণ করিয়াছেন।

হনুমান রাবণের গুণাবলীর প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রাবণের রূপ শৌর্য্য বীর্য্য বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, তাঁহার চরিত্রে যদি কয়েকটি ত্রুটি না থাকিত, তবে তিনি দেবরাজ পদের উপযুক্ত হইতেন। রামচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন, রাবণ ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, সুতরাং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ক্ষত্রিয়োচিত হওয়া উচিত। বিভীষণ রাবণের ক্ষত্রিয়োচিত গুণাবলীর প্রশংসা করিয়াছেন।

রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র তুলনামূলকভাবে আলোচনা করিলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রাক্ষসের তুলনায় মানুষ হীনপ্রভ, স্বল্পবীর্য্য; মানব সভ্যতার তুলনায় রাক্ষসসভ্যতা উজ্জ্বল। বাল্মীকি স্বয়ং ব্রাহ্মণ, সুতরাং উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার সহজ সহানুভূতি রামায়ণের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। বাল্মীকি ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার বিজয় ঘোষণা করিবার জন্য রাক্ষসের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যুদস্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেই কার্য্যের জন্য রামচন্দ্রকে বানরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সর্ব্বশেষে রাক্ষস বিভীষণ, বানর সুগ্রীব ও হনুমান প্রভৃতি বীরগণ ব্রাহ্মণ্য সভ্যতাই গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট (গ)

অপ্সরা

আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে।

* * * *

কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

রবীন্দ্রনাথ উর্ব্বশীর প্রশস্তির মধ্য দিয়া অপ্সরার জন্ম-কাহিনীর অপরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। আদিম যুগ, বসন্তকাল, ক্ষীরোদসাগর মন্থিত; দেবাসুর অমৃতের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত। এমন সময় সাগর হইতে উত্থিতা হইলেন—অপরূপ লাবণ্যময়ী, পূর্ণযৌবনা, নগ্নকান্তি উর্ব্বশী; তাঁহার একহস্তে সুধাপাত্র, একহস্তে বিষভাণ্ড। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্রগর্ভ হইতে অসংখ্য অপরূপ সুন্দরী নারী উত্থিতা হইয়াছিলেন। এই সমস্ত নারীদিগকে দেবাসুর কেহই গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন; কারণ, তাঁহাদের বংশ কিংবা গোত্রের কোন পরিচয় ছিল না; সুতরাং তাঁহারা "সাধারণী" নামে পরিচিতা হইলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র এই সলিলোত্থিতা রূপলাবণ্যময়ী অনন্তযৌবনা নারীদিগকে বন্দনা করিয়া সুর সভায় অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা সুরসভাতলে নর্ত্তকীপদ লাভ করিলেন। অপঃ (জল) হইতে উত্থিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা অপ্সরা নামে পরিচিতা হইলেন (অপ্তুঃ সরতি ইতি অপ্সরা)। এই হইল অপ্সরার জন্মকাহিনীর পৌরাণিক ইতিহাস। এই কাহিনী রামায়ণের আদিকাণ্ডে এইরূপই বর্ণিত আছে ঃ—

অপ্সু নির্ম্মথনাদেব রসাত্তস্মাদ্বরস্ত্রিয়ঃ
উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্॥

* * * *

ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্ণন্তি সর্ব্বে তে দেবদানবাঃ।
অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ। ১।৪৫।৩৩,৩৫

হরিবংশে উল্লিখিত আছে যে, অপ্সরা ব্রহ্মার 'সঙ্কল্পজাতা কন্যা' (হরিবংশ ১২৪৭৬)—অন্ততঃ তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকটি। অন্যস্থানে উল্লেখ আছে যে, অপ্সরাগণ দক্ষকন্যার সন্তান। ব্রহ্মার সঙ্কল্পজাতা অপ্সরাদের মধ্যে মেনকাদি একাদশ জন বিখ্যাত অপ্সরার নাম উল্লেখ আছে। তাঁহাদের অন্য নাম 'বৈদিকী'। তাঁহারা ছিলেন দৈবভাবাপন্ন, বেদেও তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ আছে, যথা—মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, অম্লম্লোচা, প্রম্লোচা এবং মনোবতী। বায়ুপুরাণে উল্লেখ আছে যে, নারায়ণের ঊরু হইতে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অপ্সরা উদ্ভূতা হইয়াছিলেন ; ঊরু হইতে উদ্ভূত বলিয়া উহার নাম উর্ব্বশী (বায়ুপুরাণ ৫২, ৬৯ ৯০)। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে সুন্দরী অষ্টাদশ বিখ্যাত অপ্সরার নামের উল্লেখ আছে। কাশ্যপ ঋষির ঔরসে তাঁহারা দক্ষের অন্যতমা কন্যা মুনির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অষ্টাদশ অপ্সরার মধ্যে তিলোত্তমা, রম্ভা, অলম্বুষা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা 'মৌনেয়' অপ্সরা নামে পরিচিতা। হরিবংশের উল্লেখ অনুসারে মুনি প্রধান অপ্সরাদিগের জননী (হরিবংশ ১১৫৫৪); মার্কেণ্ডেয় পুরাণ ১০৪ অনুসারে মুনি গন্ধর্ব্বদিগের জননী। বিষ্ণুপুরাণে (১,২১,২৪) উল্লেখ আছে যে, সমস্ত অপ্সরাই মুনির গর্ভসম্ভূতা। দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে সুপর্ণ, বরুণ, চিত্ররথ, নারদ প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের কেহ দেবতা, কেহ বা গন্ধর্ব্ব (মহাভারত, আদিপর্ব্ব ৬৫ শ্লোক)।

রামায়ণ এবং মহাভারতে বর্ণিত অপ্সরাদের মধ্যে মেনকা, উর্ব্বশী, ঘৃতাচী, মিশ্রকেশী এবং রম্ভার বহুবার উল্লেখ আছে। অন্যদিকে গন্ধর্ব্বদের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা, চিত্রসেনা এবং সুগন্ধার নামই বেশী প্রচলিত। যক্ষরাজ কুবেরের প্রিয় অপ্সরা ছিলেন ভর্গা।

মেরুপর্ব্বত ছিল সাধারণতঃ অপ্সরাদের আবাস। মহেন্দ্র পর্ব্বত এবং মলয় পর্ব্বতও অপ্সরাদের প্রিয় বাসভূমি ছিল। তাঁহারা সরস্বতী, কাবেরী, যমুনা এবং গঙ্গার তটভূমিতে বাস করিতেন। নন্দন, মন্দার, মুঞ্জবৎ প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলেও অপ্সরার সন্ধান পাওয়া যায়। অপ্সরা ছিলেন নৃত্যগীতবিলাসিনী। দেবতাদের সভায় অপ্সরাদের গতি ছিল অবারিত। মানুষের সভাতেও অপ্সরাদের গমনাগমন ছিল। রাজা দিলীপের যজ্ঞভূমিতে অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন (মহাভারত, ৭।৬১।৭)। গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু এই নৃত্য সভায় সঙ্গীত সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

অপ্সরাগণ দেববালা, দেবপত্নী এবং দেব-সঙ্গিনী নামে পরিচিতা ছিলেন। তাঁহারা রত্ন, মাল্যচন্দন এবং সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবহার করিতেন, কণ্ঠে হার, কটিতে মেখলা এবং চরণে নূপুর পরিধান করিতেন। নন্দনকাননের দ্বারে অপ্সরাগণ মাল্য হস্তে পুণ্যাত্মাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেন। বীণা, বল্লকী, মুরজ এবং ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা অভ্যাগত জনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। তাঁহাদের কেশদাম পঞ্চ বেণীতে বিভক্ত ছিল। সেই বেণী চূড়াকারে শিরের শোভাবর্দ্ধন করিত। সুতরাং অপ্সরার অন্য নাম পঞ্চবেণী। অপ্সরাগণ তীরে বসন ত্যাগ করিয়া মন্দাকিনীতে অবগাহন ও লীলা করিতেন। ব্যাসদেব মন্দাকিনীতে অপ্সরাগণকে ত্যক্তবসনা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। শুকদেব কিন্তু ত্যক্তবসনা লীলা-বিলাসিনী অপ্সরাদিগকে দেখিয়া কুণ্ঠিত হন নাই, কারণ শুকদেব ছিলেন নিষ্পাপ, আত্মস্থ এবং বিদেহ।

নৃত্য অপ্সরাদের জীবনের অঙ্গ। মুনিঋষিদের আশ্রমে শুভকর্ম্মে এবং তাঁহাদের প্রীত্যর্থে গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেন। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে ইন্দ্র, কুবের এবং ব্রহ্মার সভা হইতে বহু অপ্সরা নৃত্য করিতে আসিয়াছিলেন (রামায়ণ ২।৯১।১৬)। দৈত্যের সভায়ও অপ্সরা নৃত্য করিতেন। পদ্মপুরাণে আছে জালন্ধর দৈত্যের সভায় অপ্সরাগণ নৃত্য গীতের জন্য নিযুক্ত ছিলেন (পদ্ম, উত্তর ৮)। মেনকা

কুবেরের সভায় নৃত্য করিয়াছেন, (মহা-সভা ১০)। পুঞ্জিকস্থলা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর রাজসভায় নৃত্য করিতেন (মৎস, ১৬১)।

অপ্সরাগণ অত্যধিক দেহ-বিলাসিনী ছিলেন। এইজন্য অপ্সরার অন্য নাম রতি এবং বিশেষ করিয়া একজন বিশিষ্টা অপ্সরা রতি নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। হতাশ প্রেমিকা নারী রতি নাম্নী অপ্সরাকে অর্ঘ্য ,প্রদান করিতেন এবং রতিকে কেন্দ্র করিয়া প্রেমের দেবতার উৎসব করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

সরস্বতী নদীর তীরে সুভূমিক নামে একটি তীর্থ ছিল। সেখানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং মুনিঋষিগণ অন্ততঃ মাসান্তে একবার করিয়া দীব্যক্রীড়া উপভোগ করিতেন। পুরাণে দেখা যায় যে, অপ্সরাগণ দেবতার মনস্তুষ্টির জন্য মুনিগণের ধ্যান এবং তপস্যা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেন। অলঙ্কার-বিভূষিতা নৃত্যপটিয়সী সঙ্গীত-বিলাসিনী অপ্সরাগণ বহুস্থানে চটুল নয়নাঘাতে কিম্বা লীলায়িত দেহ-ভঙ্গীর দ্বারা মুনি ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছেন।

অপ্সরাগণের বিবাহ সম্বন্ধ ছিল। অপ্সরাগণের মধ্যে পুরুষ ছিল না। অপ্সরাগণ অন্য জাতীয় পুরুষের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করিতেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আছে যে, কুবেরের পুত্র নলকুবের রম্ভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অপ্সরাদের বিবাহ চিরন্তন ছিল না। তাঁহারা সকৃৎ ভর্ত্তা ছিলেন না অর্থাৎ তাঁহাদের একমাত্র স্বামী থাকিতেন না। রাবণ একদা রম্ভাকে দিব্যবসনে বিভূষিতা হইয়া পথে গমন করিতে দেখিলেন। রাবণ রম্ভার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পথরোধ করিলেন। রম্ভা বলিলেন, "আমার পথরোধ করিয়া আমায় অপমান করিবেন না। আমি আপনার ভ্রাতা কুবেরের পুত্রবধূ, সুতরাং আপনারও পুত্রবধূ।" রাবণ বলিলেন—

দেবলোকস্থিতিরিয়ং সুরাণাং শাশ্বতী মতা॥
পতিরপ্সরসাং নাস্তি ন চৈকস্ত্রীপরিগ্রহঃ। ৭।৩১।৩৯-৪০

অর্থাৎ তুমি যদি কোন পুরুষের একমাত্র স্ত্রী হইতে তোমার যুক্তি

গ্রহণযোগ্য হইত। তুমি অপ্সরা। অপ্সরা নারীর সর্ব্বদা এক স্বামী থাকে না।

মেনকা ঊর্ণায়ুর পত্নী ছিলেন। তিনিই প্রমদ্বরার মাতা, অথচ এই প্রমদ্বরার পিতা ছিলেন গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু। প্রতিষ্ঠানপুরের অধিপতি পুরুরাজের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ুর জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র নহুষ। কথিত আছে, এই নিষ্করুণা মেনকা জন্মের পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রমদ্বরা যৌবনে ঘৃতাচী অপ্সরার পুত্রকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মেনকা তাঁহার অন্যতমা কন্যা শকুন্তলাকেও জন্মের পরেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইন্দ্রের প্ররোচনায় বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের ফলেই শকুন্তলার জন্ম হইয়াছিল।

ইন্দ্র অপ্সরা দ্বারা অনেক অবাঞ্ছিত কর্ম্ম করাইয়াছিলেন। পুরাকালে তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত লাভ করা যাইতে পা।রত। সুতরাং ইন্দ্র অপরকে কঠোর তপস্যা অথবা যজ্ঞে নিয়োজিত দেখিলে আতঙ্কিত হইতেন। অপরের যজ্ঞ ও তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য ইন্দ্র অপ্সরাদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। পুঞ্জিকস্থলা নামক অপ্সরাকে মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ করেন (ভাগ, ১২ শ্লো) ; রম্ভা ইন্দ্রের আদেশে জাবালীর তপোভঙ্গ করিয়াছিলেন (স্কন্দ-নাগ, ১৪৩) ; দধীচিকে আকর্ষণ করিবার জন্য অলম্বুষাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। অলম্বুষার গর্ভে সারস্বত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঘৃতাচী ভরদ্বাজের তপোভঙ্গ করিয়াছিলেন, ফলে দ্রোণের জন্ম হইয়াছিল। বিভাণ্ডক মুনির তপস্যা ভঙ্গের জন্য অপ্সরা উর্ব্বশীকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিভাণ্ডক-উর্ব্বশীর পুত্র হইলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। উর্ব্বশী ও পুরূরবার কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশী ছয়টি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিলোত্তমা রাক্ষসদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। কিম্বদন্তি অনুসারে তিলোত্তমার রূপ দর্শনের জন্য ইন্দ্র সহস্র চক্ষু হইয়াছিলেন এবং শিব চতুরানন হইয়াছিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই দৈত্যকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বের সমস্ত

সৌন্দর্য্যকে তিল তিল সংগ্রহ ও সংযুক্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটি অপ্সরা সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার নাম তিলোত্তমা। বৃত্রের পিতা ত্রিশিরা নামক রাক্ষসের তপোভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্র "শৃঙ্গারবেশা" চাঞ্চল্যময়ী তিনটি অপ্সরা প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই অপ্সরাদের অপাঙ্গ দৃষ্টি এবং লাস্যময়ী হাস্য ত্রিশিরাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন মেনকা (দেবী ভাগবৎ, ৯ম স্কন্ধ)।

অপ্সরাগণ স্বর্গের নর্ত্তকী বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিতা। দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীতে অপ্সরাগণ সতত নৃত্য করিতেন। অপরাধ করিলে অভিশাপগ্রস্ত অপ্সরাগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতেন। ইন্দ্রের নৃত্য সভায় তাল নষ্ট হওয়ার অপরাধে ইন্দ্রের অভিশাপে রম্ভা বিকলাঙ্গ হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, অপ্সরা আদ্রিকা ব্রহ্মার অভিশাপে যমুনা নদীতে মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে রাজা বসুর ঔরসে আদ্রিকার সত্যবতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সত্যবতীর পুত্র ছিলেন ব্যাসদেব (মহা-আদি, ১৬)। ব্যাসদেবের ঔরসে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন। শুকদেবের জন্মকালে অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। হাহা এবং হুহু নামে গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত এবং বাদ্য দ্বারা শুকদেবের শুভ জন্মক্ষণকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। দুষ্মন্তের জন্মকালেও অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। ভীষ্ম যেদিন কৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন অপ্সরাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। অপ্সরাগণও অভিশাপ দিতে পারিতেন। ঘৃতাচী বিশ্বামিত্রকে শাপ দিয়াছিলেন, ফলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এক গোপবালাকে বিবাহ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—ব্রহ্ম-১০)।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, অপ্সরাগণ স্বেচ্ছায় মুনি-ঋষিগণের ব্রত ভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছেন। ভর্গা, সৌরভী, সমীচী, বুদবুদা এবং লটা নাম্নী পাঁচজন অপ্সরা একজন ব্রাহ্মণের তপোভঙ্গের চেষ্টা করার অপরাধে এক বৎসরের জন্য কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইলেন। রামায়ণে এই পাঁচজন অপ্সরার অধ্যুষিত একটি সরোবরের উল্লেখ আছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে অপ্সরা অন্তরাক্ষে উপস্থিত থাকিয়া বীরদিগকে 'সাধু সাধু' বলিয়া উৎসাহিত করিতেন। মৃতবীরকে দিব্যরথে আরোহণ করাইয়া গীতবাদ্য সহযোগে স্বর্গে লইয়া যাইতেন। যুদ্ধজয়ী বীরদিগকে মৃত্যুর পরে অপ্সরাগণ সঙ্গাত বাদ্য ও সঙ্গ দ্বারা তৃপ্ত করিতেন (মহা ৫-২১ ; ১৩-১০৭-১৮)।

অপ্সরার সঙ্গে মানুষ, দেবতা, যক্ষ, রক্ষের বিবাহ হইত। ভরত-বংশীয় বিন্ধ্যাশ্বের ঔরসে মেনকার গর্ভে দিবোদাস ও অহল্যার জন্ম হয় (মৎস্য—৫০), মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। পুঞ্জিকস্থলার গর্ভে মহর্ষি পায়ের ঔরসে কলাবতীর জন্ম হয় (মার্ক—৬৪)। ঘৃতাচী অপ্সরার সঙ্গে রাজা কুশের পুত্র কুশনাভের বিবাহ হয়। ঘৃতাচী শত কন্যার জননী (রামা, ১।৩)। ঘৃতাচীর গর্ভে ঋষি পুত্র প্রমত্তের ঔরসে রুরু নামে এক পুত্র জন্মে (মহা, আদি-৫)। রাজর্ষি ভদ্রেশ্বরের দশকন্যা জন্মে। উহারা সকলেই অত্রির স্ত্রী ছিলেন (লিঙ্গ—৬৩)। বশিষ্ঠের ঔরসে ঘৃতাচীর কপিঞ্জল নামে এক পুত্র জন্মে (লিঙ্গ—৬৩)। যক্ষ কুবেরের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করিয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-১০)। পর্জ্জন্য নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে বেদবতীর জন্ম হয়। মনুষ পুত্র ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত বেদবতীর বিবাহ হয় (বামন-পুরাণ ৬২, ৬৫)। এই সমস্ত কাহিনী হইতে মনে হয় যে, ঘৃতাচী মানব, ঋষি, রাজর্ষি, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অন্য গোষ্ঠীর পুরুষ জাতির সংস্পর্শে আসিতেন। হেমা নাম্নী অপ্সরা ময়দানবকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। তাঁহারই কন্যা মন্দোদরীকে রাবণ বিবাহ করিয়াছিলেন। (রামা ৪-৫-৩৯)। পুঞ্জিকস্থলা অভিশাপগ্রস্ত হইয়া অঞ্জনা নামে বানররাজ কুঞ্জরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অঞ্জনার সঙ্গে কেশরীর বিবাহ হয় (রামা ৪-৬৬-৮); অঞ্জনার গর্ভে পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম।

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, নাগ, পনগ প্রভৃতি গোষ্ঠীর আংশিক আলেক্ষ্য রচনা করা যাইতে পারে। ঐ আলেখ্য বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

পরিশিষ্ট (ঘ)

যক্ষ কুবের

রাক্ষসবংশের সহিত যক্ষবংশের সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পরিশিষ্টাংশে কুবের বৃত্তান্ত আলোচিত হইল। সাধারণ পরিচয়ে যক্ষরাজ কুবের রাক্ষসরাজ রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁহাদের পিতা পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা মুনি, কুবেরের মাতা ঋষি ভরদ্বাজ কন্যা দেববর্ণিনী। কুবেরের অন্য নাম চৈত্ররথ, রাবণের মাতা সুমালী রক্ষকন্যা কৈকসী।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিকাণ্ডে বর্ণিত আছে যে, যক্ষগণ কশ্যপের ঔরসে খসার গর্ভে জাত। বামন পুরাণে ষষ্ঠ খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, কুবের ছিলেন কাপালিক। হরিবংশে কুবের দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (১৩৯৮৯)। কুবের শব্দের অর্থ কুৎসিত দেহ (কু= কুৎসিত, বের=দেহ)। হরিবংশে যক্ষ কুবেরের রূপ বর্ণিত আছে—রক্তচক্ষু, কৃষ্ণবর্ণ, মায়ারূপী। যক্ষগণ ইচ্ছামত সুন্দররূপ ধারণ করিতে পারিত। কুবের কর্ণে কুণ্ডল পরিধান করিতেন। সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, তাঁহার চরণ নিম্নে পাদপীঠ ছিল। কুবের বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা—একাক্ষি পিঙ্গল, ভূতেশ, ঐলবিল, (মহা ৯।৪৭।২৫) যক্ষরাজ, শিবসখা, ধনদ, গুহ্যক, মণিকার, নরবাহন, নৈঋতাধিপতি, গুহ্যকবাহন, উত্তরলোকপাল, বিত্তরক্ষক, নিধিসত্ত্ব, দেবসম। হরিবংশেও উল্লেখ আছে, যক্ষগণ দক্ষকন্যা খসার গর্ভসম্ভূত (হরিবংশ ২৩৪, ১৬৯)।

কুবেরের নিবাস প্রথমে ছিল লঙ্কায়। রাবণ ব্রহ্মার বরলাভে শক্তিশালী হইলে কুবের পিতার অনুরোধ রাবণকে পূর্ব্বপুরুষের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া হিমালয়ের কৈলাস পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। যক্ষপুরী ছিল উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত পতাকা শোভিত, বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ, সুবর্ণ স্ফটিক নির্ম্মিত গৃহ শোভিত। যক্ষপুরীতে কিন্নর, নাগ, রাক্ষস বাস

করিতেন। যক্ষপুরীতে শিব, উমা, ইন্দ্র ও বিদ্যাধরগণ যাতায়াত করিতেন। কুবের গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিহার করিতেন। মন্দার পর্ব্বত পরিভ্রমণ করিতেন (মহা ১২-৪৪-১৩)। কুবেরের একাধিক নর্ম্ম উদ্যান ছিল, উহাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল হৈমবত। উহার বিশেষণ ছিল নলিনীরম্যা, কুবের কান্তা (মহা ৩-১৭৭-৯)। উত্তর পর্ব্বতে তিন লক্ষ বাহান্ন সহস্র যক্ষিনী বাস করিত।

কুবের স্ত্রী প্রজাপতি দক্ষের সপ্তকন্যা—আহূতি, ভদ্রা, ঋদ্ধি প্রভৃতি। কুবেরের পুত্রগণের নাম নলকুবের, মণিগ্রীব, সুপ্রতীক ও সার্ব্বভৌম। অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে কুবেরের কন্যা চিত্রার জন্ম হয়। নারদের অভিশাপে তাঁহার দুই পুত্র বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে তাঁহারা শাপমুক্ত হইয়াছিল।

কুবেরের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রধান ছিল পুষ্পক রথ, অষ্টনিধি ও স্বর্ণাবৃত মেরু পর্ব্বত। ইন্দ্রের নন্দনবন দক্ষরাজ ও যক্ষরাজের যৌথ সম্পদ ছিল। কুবের দেবতাদিগের ধনরক্ষক ছিলেন। কুবেরের চৈত্ররথ রাবণ বিনষ্ট করেন। উশনা কর্ত্তৃক কুবেরের ঐশ্বর্য্য অপহৃত হইয়াছিল। কুবেরের একখানি অশ্ববাহিত রথও ছিল। অমরাবতীর এক চতুর্থাংশ সুবর্ণ কুবেরের সম্পদ ছিল (মহা-৫-১০৯-১৬)। কুবেরের অন্যতম বাহন ছিল হস্তী ; সেই হস্তীর নাম ছিল সার্ব্বভৌম (রা-৫।৩৪। ২৮)। তাঁহার প্রধান বাহন পুষ্পক রথ ছিল হংসবাহিত।* কুবের-কেশী সংগ্রাম পুরাণে বিখ্যাত। রাক্ষসদের সহিত কুবেরের দীর্ঘকাল যুদ্ধ হইয়াছিল। দেবাসুর সংগ্রামে যক্ষগণ দেবতাদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। অনুহ্রদার সহিত কুবেরের যুদ্ধের বিবরণ পুরাণে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। কুবেরের প্রিয় অস্ত্র ছিল গদা। মণিমৎ রাক্ষস যক্ষরাজ কুবেরের প্রিয় বন্ধু ছিল।

---

*রথের আকৃতি অথবা স্মারক অনুসারে নামকরণ করা হইত। হংস, মরাল, সিংহ, বাহন হইতে অনুমান করা যায় যে, ঐ সমস্ত রথগুলি ঐ প্রকার চিহ্নযুক্ত পতাকা সমন্বিত ছিল, অথবা রথগুলির আকৃতি ঐ প্রকার ছিল।

যক্ষগণ সাধারণতঃ বিষ্ণুর উপাসক ছিল। কুবের স্বয়ং বিরাট তপস্বী ছিলেন। তিনি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার বর লাভ করেন। শিব কুবেরের প্রতি এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে, কুবের শিবসখা বলিয়া সম্মানিত হইতেন। যক্ষদের মন্দির ও চৈত্য ছিল। কুবের অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞভাক্ ছিলেন। ব্রহ্মার বরে কুবের অন্যতম লোকপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুবেরও পূজার অর্ঘ্য লাভ করিতেন। তাঁহার পূজার অর্ঘ্য ছিল মদ্য, মাংস, সর্ষপবীজ ও পুষ্প। কুবের অভিশাপ দ্বারা তুম্বুরু যক্ষকে বিরাধ রাক্ষসে পরিণত করেন।

যক্ষ কুবের ছিলেন দয়ালু, পরহিতব্রতী। যক্ষগণ দেবপুরীর রক্ষক ছিল। যক্ষগণ কখনও দেবতারূপে, কখনও বা অপদেবতারূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহারা নাগদের পর্য্যায়ভুক্ত, কখনও বা রাক্ষসের সমগোত্রীয়রূপে পরিচিত। যক্ষের ঔরসে বানরীর গর্ভে বহু সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। উহার মধ্যে একজন বানর বীর গন্ধমাদন নামে বিখ্যাত। সূর্য্যদেব তাঁহার পুত্র অর্জ্জুনের পত্নী দ্রৌপদীকে রক্ষা করিবার জন্য একজন যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন (মহা, ৪-১৬-১১)।

—সমাপ্ত—